এপ্রিল ২০২৩ ■ চৈত্র ১৪২৯-বৈশাখ ১৪৩০

নবারুণ মেলা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের
সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

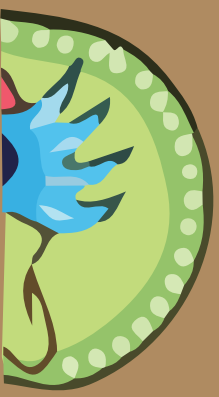

রং ছড়ানো আনন্দ আয়োজন

তাছনিম আক্তার শিফা, সপ্তম শ্রেণি, কাজকামতা আশ্রাফিয়া আলিম মাদ্রাসা, কুমিল্লা

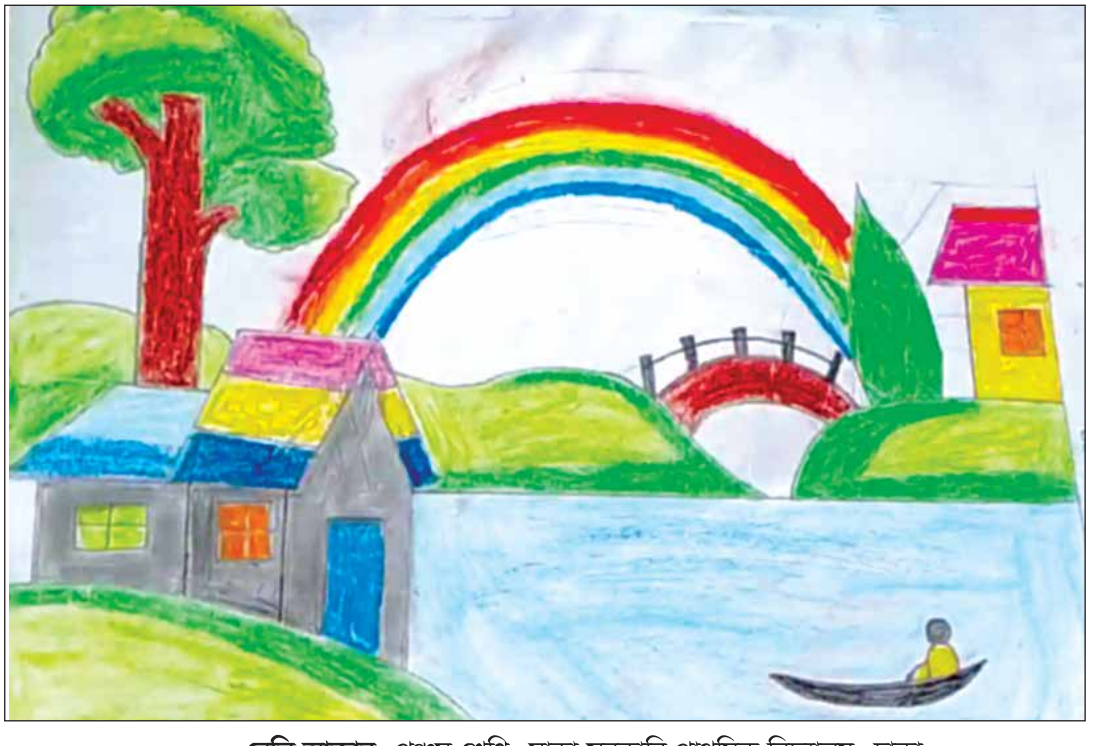

বেলি আক্তার, পঞ্চম শ্রেণি, মান্ডা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঢাকা

সম্পাদকীয়

বন্ধুরা, তোমাদের জানাই বাংলা নববর্ষ ১৪৩০-এর শুভেচ্ছা। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। নতুন বছর মানেই আনন্দ আর উদ্দীপনা। পুরনো বছরের সব গ্লানি, দুঃখ-বেদনা ভুলে আমরা নতুন করে সাজাবো সামনের দিনগুলো। প্রতি বছরের মতো এবারও মঙ্গল শোভাযাত্রা হলো। মঙ্গল শোভাযাত্রার এবারের প্রতিপাদ্য ছিল 'বরিষ ধরা– মাঝে শান্তির বারি'।

বন্ধুরা, বাংলা নববর্ষ বাঙালির সর্বজনীন উৎসব। এটি আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই তো বৈশাখকে বরণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, এসো হে বৈশাখ, এসো এসো...। বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গ্রামে-গঞ্জে, শহর-বন্দরে সকলে নানা রঙের পোশাক পরে, ঐতিহ্যবাহী খাবার খায়, মেলায় যায়, নৌকা বাইচের আয়োজন করে, জারি-সারি গান গায় আর নির্মল আনন্দ উৎসবে মেতে উঠে। বন্ধুরা, তোমরাও নিশ্চয়ই অনেক আনন্দ করেছ, মেলায় গিয়েছ।

ছোট্ট সোনামণিরা, এই তো গেল পবিত্র ঈদুল-ফিতর। তোমরা নিশ্চয়ই অনেক আনন্দ করে দিনটি উদ্‌যাপন করেছ। নতুন নতুন জামাকাপড় পরেছ ও মজার মজার খাবার খেয়েছ। তোমাদের সবাইকে জানাই পবিত্র ঈদুল-ফিতরের শুভেচ্ছা।

১৭ই এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার 'মুজিবনগর সরকার' গঠিত হয়। ১৭ই এপ্রিল এ সরকার শপথ গ্রহণ করে। আমরা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি ইতিহাসের সেই বীর নায়কদের।

বন্ধুরা, এবারের সংখ্যাটি আমরা সাজিয়েছি আমাদের দেশের জানা-অজানা নানা মেলা নিয়ে। বৃক্ষমেলা, পুষ্পমেলা, পার্বত্য মেলা, বাণিজ্যমেলা, ডিজিটাল মেলা, ব্যতিক্রমী মেলাসহ মজার সব মেলা তুলে ধরেছি তোমাদের জন্য। আরো আছে মেলার খেলা, খাবারসহ অনেক কিছু। এছাড়া গল্প, কবিতা, ছড়া এসব তো রয়েছেই। আশা করি নতুন করে সাজানো এ সংখ্যাটি তোমাদের খুব ভালো লাগবে। ভালো থেকো বন্ধুরা, তোমাদের জন্য শুভকামনা।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
ডালিয়া ইয়াসমিন

সম্পাদক
নুসরাত জাহান

সিনিয়র সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ

সহ-সম্পাদক
মো. জামাল উদ্দিন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মেজবাউল হক
মো. মাছুদ আলম
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

মূল্য : ২০.০০ টাকা

মুদ্রণ : রূপা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
২৮/এ-৫ টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা।

সূচিপত্র

নিবন্ধ

স্বাধীন দেশের নতুন সরকার/সরকার আবদুল মান্নান ০৩
মেলা : রং ছড়ানো আনন্দ আয়োজন/আনজীর লিটন ০৬
পহেলা বৈশাখের জন্মযাত্রা/মাহবুব রেজা ১২
মেলার কথন/হাছিনা আক্তার ২০
বৈশাখের নানা আয়োজন/শামস্ নূর ২২
মেলায় যাইরে কিছু খাইরে/রাজিউর রহমান ২৮
ছড়া কবিতায় মেলা/মো. সিরাজুল ইসলাম ৩০
লোক ও কারুশিল্প মেলা/জাহিদ হাসান ৩৬
আকাশে ঘুড়ির মেলা/রওশন রুমি ৩৭
পুষ্প মেলা ও বৃক্ষ মেলা/মো. জোবায়ের হোসেন ৩৯
প্রজাপতি মেলা ও পাখি মেলা/মো. জামাল উদ্দিন ৪০
ভিনদেশের নববর্ষ/রঘু অভিজিৎ রায় ৪১
শত বছরের মেলা/শাহানা আফরোজ ৪৩
গুণীজনের মেলা/রিয়াদুল ইসলাম ৪৫
পার্বত্য মেলা/ফারজানা হক ৪৬
ব্যতিক্রমী মেলা/নাজমুল ইসলাম ফারুক ৪৭
মেলার যত খেলা/মেজবাউল হক ৪৯
অদ্ভুত মেলা/বশিরুল ইসলাম ৫১
বিনিময় মেলা/খালেক আবদুল্লাহ ৫২
বাণিজ্য মেলা/আলেয়া রহমান ৫৩
অমর একুশে গ্রন্থমেলা/তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা ৫৭
ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলা /রেজা নওফল হায়দার ৫৮
মজার সব মেলা/সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি ৫৯

কবিতা ও ছড়া

১৬ শাফিকুর রাহী/গোলাম নবী পান্না
১৯ আফরোজা নাইচ রিমা
৩৮ আসমা আক্তার হুমায়রা
৪৮ মিয়াজান কবীর
৫৪ সালাম ফারুক/রাশেদ আহাম্মেদ সাদী
আবুল হোসেন আজাদ
৫৫ খোরশেদ আলম নয়ন/কাজী নুসরাত সুলতানা
৫৬ গোপেশচন্দ্র সূত্রধর

গল্প

১০ চৈত্রসংক্রান্তির মেলায়/আহসান হাবীব
১৭ মেলায় গেল তালপাতাটা/আহমেদ রিয়াজ
২৫ মুড়ি মুড়কি খই/তারিক মনজুর
৩৪ মেলা নিয়ে গালগল্প/মুন্সী নজরুল ইসলাম

ছোটোদের ছড়া/লেখা

৪৮ দীপ্ত দাস
৫৬ নিশি কাদের/মো.পারভেজ হোসাইন

ধাঁধা

৬১ বুদ্ধিতে ধার দাও/নাদিম মজিদ

ছোটোদের আঁকা

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : তাছনিম আক্তার শিফা/বেলি আক্তার
তৃতীয় প্রচ্ছদ : উম্মে মেহেজাবিন রাইসা/আয়েশা ইসলাম
৬৩ মায়সুর ইযমান/মাশরুর সাফির
৬৪ মো. ইহসানুল হক বসুনীয়া/মোছা. ওকি

নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় Nobarun Potrika আপলোডেড পত্রিকা পড়তে পারবে।

এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dfp.gov.bd-এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

স্বাধীন দেশের নতুন সরকার

সরকার আবদুল মান্নান

আমরা এখন একটি স্বাধীন দেশে বসবাস করছি। বর্তমানে তোমরা যারা শিশু, কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী কিংবা যুবক-যুবতী– পরাধীন দেশে বসবাস করার তিক্ত অভিজ্ঞতা তোমাদের নেই। এ তোমাদের পরম সৌভাগ্য। তোমাদের এই সৌভাগ্য এনে দেওয়ার জন্য মুক্তিযুদ্ধে এদেশের কত মানুষ যে আত্মাহুতি দিয়েছেন, তার হিসাব-নিকাশ নেই। সেই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে মুজিবনগর সরকার নামে একটি অস্থায়ী সরকার, সে সরকারের মন্ত্রী, নির্বাচিত প্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তাদের নিরলস প্রচেষ্টায় এবং বিপুল ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে এদেশের স্বাধীনতা। আর তারই ফলে আজ আমরা একটি স্বাধীন দেশের গর্বিত নাগরিক।

আমরা সবাই জানি, ১৯৪৭ সালে তৎকালীন পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে একটি দেশের অভ্যুদয় ঘটে। সেই দেশটির নাম ছিল পাকিস্তান। আমরা তখন ছিলাম পূর্ব পাকিস্তানের তথা পূর্ব বাংলার অধিবাসী। আর আমাদের শাসন করত পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত প্রায় ২৩ বছর পশ্চিম পাকিস্তানের লোকেরা আমাদের শাসন করেছে, শোষণ করেছে, নিপীড়ন-নির্যাতন করেছে এবং সকল ন্যায্য অধিকার থেকে আমাদের বঞ্চিত করেছে। আর সেই বঞ্চনার ইতিহাসও আমাদের জানা আছে।

তারই পরিপ্রেক্ষিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে, জেল-জুলুম আর অত্যাচার-অবিচারের অনেক দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে আমরা ১৯৭০-এর নির্বাচনে এসে পৌঁছি। সেই নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নৌকা প্রতীকে বিপুলভাবে জয় লাভ করে। একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেলেও পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আওয়ামী

লীগের নেতৃত্বে সরকার গঠনে নানারকম তালবাহানার আশ্রয় নেয়। আর তারই পটভূমিতে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) লক্ষ জনতার সামনে ঐতিহাসিক এক ভাষণ প্রদান করেন কিংবদন্তি নায়ক শেখ মুজিবুর রহমান। ওই ভাষণে তিনি বলেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। বলা যায়, এই প্রথম তিনি অনানুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এই ঘোষণার আগে থেকেই বাংলাদেশের মানুষ ধর্ম, বর্ণ জাতি, শ্রেণি, পেশা নির্বিশেষে একটি মাত্র মঞ্চে এসে জড়ো হয়েছিলেন, আর সেই মঞ্চটি ছিল আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম। সেখান থেকে অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রশাসনিক কার্যক্রম, ব্যাবসা-বাণিজ্যসহ সব কার্যক্রম নিজেদের হাতে নিয়ে আসেন এদেশের মানুষ। তখন বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ ছাড়া বাংলাদেশে কোনো কার্যক্রমই পরিচালিত হতো না।

এমন অবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী নির্মম এক পরিকল্পনা গ্রহণ করে, আর তা হলো, রাতের অন্ধকারে বাঙালি জাতির উপর আক্রমণ চালিয়ে আমাদের এই দেশটিকে ধ্বংস করে দেওয়া।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে অপারেশন সার্চলাইট নামে সেই আক্রমণে ঢাকা শহরের শতসহস্র ঘুমন্ত মানুষ হত্যা করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু ইপিআর-এর একটি ছোটো ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। বঙ্গবন্ধুকে বন্দি করা হয় ওই রাতেই। বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাসে আমরা এই প্রথম স্বাধীনতার আস্বাদ লাভ করি। কিন্তু বিজয়ের জন্য যুদ্ধ তখন মাত্র শুরু হয়েছিল। বিজয় অর্জন করতে হলে আমাদের অনেকটা পথ অতিক্রম করতে হবে। আর তারই পটভূমিতে ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল নির্বাচনে বিজয়ী এমএনএ ও এমপিদের নিয়ে গঠন করা হয় মুজিবনগর সরকার।

বঙ্গবন্ধু তখন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি। পাকিস্তানের কাছ থেকে বিজয় অর্জনের জন্য যুদ্ধ চলছে দেশে। পাকিস্তানের সঙ্গে সুসংগঠিত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্বাধীন বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর, অধিদপ্তর, ব্যাবসা-বাণিজ্য, ব্যাংক-বীমা পরিচালনার জন্য এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ যোগাযোগ রক্ষা করে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠন করার জন্য একটি সরকার গঠন করা তখন অনিবার্য হয়ে ওঠে। আর সেই কথা বিবেচনা করে তাজউদ্দীন আহমদের নিরন্তর প্রচেষ্টায় এবং ভারত সরকারের আন্তরিক সহযোগিতায় প্রথম গঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার। ১৭ই এপ্রিল, ১৯৭১ সালে কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করে। বর্তমানে ওই স্থানটির নাম মুজিবনগর।

এই অস্থায়ী সরকার গঠন করা তখন খুব সহজ ছিল না। কারণ দেশে যুদ্ধ চলছে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য স্থানীয়ভাবে মুক্তিবাহিনী প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য সংগঠনের নেতা-নেতৃদের অনেকেই নিজের রক্ষা করা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ এবং বিজয় ছিনিয়ে আনার জন্য কর্মকৌশল প্রস্তুত করতে আশ্রয় নিচ্ছিলেন ভারতে।

> অজপাড়াগাঁয়ের একটি পল্লি– যে আমবাগানে কখনো কিছু হতো না– সেখানে একটা দেশের সরকারের প্রথম শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান

মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা হয় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়কের দায়িত্বও ছিল তাঁর উপর। আর উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা হয় সৈয়দ নজরুল ইসলামকে। তিনি একদিকে উপরাষ্ট্রপতি ছিলেন এবং অন্যদিকে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এই সরকারের

প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ এবং এই সরকারের প্রধান কুশীলবও ছিলেন তিনি। এছাড়া মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন ক্যাপটেন এম মনসুর আলী, এ এইচ এম কামারুজ্জামান। সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান হিসেবে কর্নেল আতাউল গনি ওসমানী দায়িত্বপ্রাপ্ত হন।

ভারতের সীমান্তবর্তী অঞ্চল মেহেরপুর। আর মেহেরপুর থেকে বৈদ্যনাথতলা দশ-বারো কিলোমিটার দূরের একটি দুর্গম জনপদ। সে সময় বৈদ্যনাথতলা যেতে রাস্তাঘাট ছিল গাড়ি ও যুদ্ধযান নিয়ে যাওয়ার অনুপযোগী। নানা স্থানে ছিল খানাখন্দ, ভাঙাচুরা এবং কোথাও কোথাও রাস্তা ছিল অপ্রশস্ত। ফলে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর জন্য এই স্থানে গিয়ে আকস্মিক হামলা করা ছিল অসম্ভব। আকাশপথে হামলা করাও সহজসাধ্য ছিল না। প্রথমত স্থানটি ছিল বিশাল বিশাল আমগাছে ঢাকা। নিচের স্থানটি ছিল প্রায় ছাতার মতো ছায়াচ্ছন্ন। উপর থেকে নিশানা ঠিক করা ছিল দুরূহ। এছাড়া বিমান হামলা করতে গেলে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে ভারতের আকাশসীমা লঙ্ঘন কারার ঝুঁকি নিতে হবে। এরপরেও যদি হামলার আশঙ্কা দেখা দেয়, তাহলে খুব দ্রুততার সঙ্গে ভারতে নিরাপদে আশ্রয় নেওয়ার সুযোগ ছিল। সুতরাং সবদিক থেকেই স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার গঠনের জন্য এই স্থানটি ছিল আদর্শ স্থান। তারপরেও একটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে শত্রুপক্ষ কোনো আক্রমণ পরিচালনা করলে তা প্রতিরোধ করে সবাই নিরাপদে ভারতে চলে যেতে পারেন।

প্রত্যন্ত সেই স্থানে ছোটো একটি মঞ্চের মতো ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কাছাকাছি ভবেরপাড়ার একটি মিশনারি হাসপাতাল থেকে কিছু চেয়ার-টেবিল ধার করে নিয়ে মঞ্চ স্থাপন করা হয়। সাত-আটটি চেয়ারের মধ্যে মাঝের চেয়ারটি প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চেয়ার হিসেবে খালি রাখা হয়।

সরকার গঠনের সময় 'ডিক্লারেশন অব ইন্ডিপেন্ডেন্স' পাঠ করেন গণপরিষদের স্পিকার ইউসুফ আলী। তিনিই ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীদের শপথ বাক্য পাঠ করান।

এই নতুন সরকারের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টকে ইপিআরের লোকজনকে দিয়ে একটি গার্ড অব অনার দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু মেজর ওসমানীসহ ইপিআরের লোকজন তখনো সেখানে পৌঁছোতে না পারায় আনসারের লোকজন একত্রিত করে নতুন অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধানকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। তারপর মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে উপস্থিত মুক্তিবাহিনীর লোকজনদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।

ভাবতে অবাক লাগে, যুদ্ধ কবলিত সেই দুঃসময়ে মুজিবনগর সরকার গঠনে মুক্তিযোদ্ধাগণ, প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন বাহিনীর কর্মকর্তাগণ, ভারত সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ যে সহযোগিতা প্রদান করেছেন, তার কোনো তুলনা চলে না। আর সমস্ত কর্মযজ্ঞ পরিচালিত হয়েছে প্রাণের তাগিদে।

দেশি-বিদেশি প্রায় শতাধিক সাংবাদিককে উদ্দেশ্য করে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ তাঁর অতি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় বলেন, 'আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের সাংবাদিক বন্ধুদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই জন্যে যে, তারা আমাদের আমন্ত্রণে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটি দেখে যাওয়ার জন্য বহু কষ্ট করে, বহু দূরদূরান্ত থেকে এখানে উপস্থিত হয়েছেন।'

ওই অনুষ্ঠান আয়োজকের একজন ছিলেন সরকারি কর্মকর্তা তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী। তিনি বলেছেন, 'দিনের আলো ঝলমল করছিল, আনন্দঘন উৎসবের মতো লাগছিল। মনে হচ্ছিল প্রকৃতিও যেন এটাকে সমর্থন দিচ্ছে, আর রূপকথার মতো অনুষ্ঠানটা শেষ হলো'। তিনি আরো বলেন, 'অজপাড়াগাঁয়ের একটি পল্লি– যে আমবাগানে কখনো কিছু হতো না– সেখানে একটা দেশের সরকারের প্রথম শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। আমরা সবাই যখন চলে গেলাম, তখন যেন রূপকথার রাজকন্যাকে সোনার কাঠি দিয়ে আবার ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হলো'।

বাঙালি জাতির বিজয়ের ইতিহাসে মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রায় নয় মাসের এই সরকারের মহাকাব্যিক অবদান সোনার হরফে চিরকালের জন্য মুদ্রিত হয়ে আছে। ■

গবেষক, প্রাবন্ধিক ও শিশুসাহিত্যিক

মেলা : রং ছড়ানো আনন্দ আয়োজন

আনজীর লিটন

মেলা। এই আয়োজনের নাম মিলনমেলার হাট। রং ছড়ানো পসরা নিয়ে এই হাটে চলে বেচাকেনা। বাঁধ ভাঙা খুশির ঢল নামে মেলাকে কেন্দ্র করে। কোনো বয়সের ভেদাভেদ নেই। জাত-পাত-ধর্মের কোনো বিভেদ নেই। একত্রে শামিল হওয়াটাই যেন লক্ষ্য। আনন্দমাখা এক অদ্ভুত মুহূর্ত নিহিত থাকে এই মেলার বুকে। আর তাই যেখানে মেলার আয়োজন সেখানে যেন গন্তব্যের ঠিকানা। মেলার মাঠে বিক্রেতারা পণ্য সাজায়। ক্রেতারা পছন্দমতো সেই পণ্য কিনে নেয়। শুধু কি পণ্য বেচাকেনা? এর সঙ্গে যুক্ত থাকে বায়োস্কোপ, লাঠিখেলা, নাগরদোলা, মোরগলড়াই, বানরখেলা, পুতুলনাচ, সাপুড়ের সাপ নৃত্য কত কী! আর বাহারি খাবারের জমজমাট ফিরিস্তি না দিলেই নয়। বাতাসা, সন্দেশ, জিলাপি, নাড়ু, মুড়ি, মুড়কি, নিমকি, পুরি, সিঙারা, কদমা, মিষ্টি, হাওয়াই মিঠাই, কুলফি, চটপটি, ফুচকা, লাড্ডু, নাড়ু আরো অনেক মুখরোচক খাবার।

পুরো আয়োজনটি জুড়ে থাকে বর্ণাঢ্য বর্ণিল প্রেম। আর তাই তো মেলা মানে মমতায় জড়ানো রূপ ছড়ানো এক মিলন মোহনা। যেখানে সবাই মিলিত হয়। এজন্য বলা হয় বাঙালি সংস্কৃতির ধারা বহমান রেখেছে মেলা। কারণ মেলার আলাদা একটি ঐতিহ্য আছে।

কবে থেকে শুরু হয়েছে মেলা?

লোকমুখে শোনা আর গবেষকদের মতে, যখন থেকে মানুষ একত্রে বসবাস করতে শিখল, তারও পরে যখন হাট-বাজার বসতে শুরু করল, যখন থেকে পণ্য চাহিদা

বাড়তে থাকল সেই সময় থেকে মেলার উৎপত্তি। একসময় এই অঞ্চলের রাজা-জমিদারদের কেউ কেউ মেলার প্রচলন করেছিলেন বলে নানান জনে মত দেন। আবার কেউ কেউ বলেন, ধর্মীয় উপলক্ষ্যেও কোথাও-কোথাও মেলার প্রচলন হয়েছিল। যা এখনও চলমান। যেমন– মহররম মাসকে কেন্দ্র করে মেলা কিংবা ঈদমেলা, পূজার মেলা।

বাংলাদেশে মেলা

হ্যাঁ, এর একটা তথ্যগত ইতিহাস প্রচলিত আছে। তবে তা হচ্ছে–'বারো মাসে তেরো পার্বণ' বিষয়ক যে প্রবাদটি রয়েছে সেই প্রবাদের সূত্র ধরে কেউ কেউ বলেন, এই বাংলায় মেলা যেভাবেই আসুক না কেন, কিংবা যে জমিদারের কল্যাণে এর প্রসার ঘটুক না কেন বাংলাদেশে মেলা মানে বৈশাখি মেলা। এই মেলার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, আছে আমাদের ঐতিহ্য। ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশে আছে বাঙালির প্রাণের উৎসব বাংলা নববর্ষ। বৈশাখ মাসকে ঘিরে নববর্ষের আয়োজন। বৈশাখ বাংলা বছরের প্রথম দিন। এই দিনকে ঘিরে প্রাণে বাজে বৈশাখের ছন্দ মাখা কবিতা–

বাংলা চিনি বাংলা জানি
বাংলা আমার প্রাণ
বাংলা গানে সুর তুলিয়া
গাই বাংলার গান।
বাংলা গানের বাংলা সুরে
নতুন দিনের ডাক
বাঙালিদের ঘরে ঘরে
এসেছে বৈশাখ।

বাঙালির প্রাণের উৎসব বাংলা নববর্ষ। বৈশাখ মাসকে ঘিরেই নববর্ষের আয়োজন। বৈশাখ মানে রঙে রঙিন। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালির প্রাণের সঙ্গে মিশে আছে নববর্ষ বরণের এই আয়োজন। বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য নিয়ে এই আয়োজন আজ মহোৎসবে পরিণত হয়েছে।

ঢাকার রমনা বটমূলে বৈশাখ বরণের গান গেয়ে বাংলা নতুন বছরকে স্বাগত জানায় সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানট। এই আয়োজনের মধ্য দিয়ে বাঙালির প্রাণে জেগে ওঠে লাল-সাদা রঙে উৎসবের সম্ভার। আমাদের চেতনায় উজ্জ্বল হয়ে আছে বৈশাখের নানা রঙের উৎসব-আয়োজনের কথা। বাংলা নববর্ষ উদযাপন আজ সম্প্রীতির মহোৎসব। বৈশাখ মানেই মেলা। মেলায় ছন্দ তোলা বাঁশির শব্দ আর নাগরদোলায় মেতে ওঠা হুল্লোড়– এই তো আমাদের চিরচেনা বৈশাখেরই ছবি। সেইসঙ্গে পান্তা-ইলিশের অপূর্ব আয়োজন। বৈশাখের সকাল রূপের মাধুর্য ছড়িয়ে ঢোল আর ঢাকে অপূর্ব ব্যঞ্জনায় মূর্ত হয়ে ওঠে। এর সঙ্গে ১৯৮৯ সাল থেকে যুক্ত হয়েছে মঙ্গল শোভাযাত্রা। বাংলা সংস্কৃতির পরিচয়বাহী নানা প্রতীকী উপকরণ, বিভিন্ন রঙের মুখোশ ও বিভিন্ন প্রাণীর

> গ্রামীণ ঐতিহ্য, ধর্মীয় ও লৌকিক উৎসবের আয়োজন নিয়ে মেলা শহরেই হোক কিংবা গ্রামেই হোক লোকজ সংস্কৃতির সঙ্গে ভর করেই এই মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। তবে সব মেলার সেরা মেলা হিসেবে হৃদয়ে সুখ স্মৃতি জমা করে দেয় বৈশাখি মেলা।

প্রতিকৃতি নিয়ে এই মঙ্গল শোভাযাত্রা বাংলাদেশের সর্বজনীন সংস্কৃতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। স্থান করে নিয়েছে ইউনেস্কোর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায়।

বৈশাখ আমাদের লোকজধারার সংস্কৃতির শুধু পরিচয় বহন করে না, বৈশাখ বাঙালির শিল্প-সংস্কৃতি ও সাহিত্য সৃষ্টির এক অপরূপ প্রেরণাদাতা। আর তাই তো প্রকৃত বাঙালিজন বার বার ফিরে যায় তার নিজস্ব শেকড়ে, মাটির বন্ধনে; যেখান থেকে তুলে আনে তার ঐতিহ্যের গল্প। তুলে আনে তার পরিবারের গল্প। একই সঙ্গে তুলে আনে সামাজিকতা, লৌকিকতা ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল

থেকে অর্জিত আচার-রীতি। এসবই বাঙালি জীবনের অমূল্য প্রাপ্তি। প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম যা লালন করে আসছে বাঙালি। বৈশাখে নববর্ষ উদ্‌যাপন তারই দৃষ্টান্ত। বাঙালিরা তাদের সৌন্দর্যচেতনা নিয়ে আমাদের এই সংস্কৃতিকে এখন ছড়িয়ে দিচ্ছে দেশ থেকে দেশান্তরে। এই নতুন প্রজন্ম বাংলাদেশকে বুকে ধরে এগিয়ে চলছে নতুন পথের দিকে। নতুন সম্ভাবনার দিকে। আর এই নতুন পথের নতুন বাঁকে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন বিশাল থেকে বিশালতর হয়ে উঠছে। ছায়ায় মোড়ানো সবুজ-শ্যামলিমা গ্রাম-বাংলার প্রান্তর পেরিয়ে, নগরজীবনের রূপবৈচিত্র্য ছাড়িয়ে বাংলাদেশের বৈশাখ মেলা হয়ে উঠেছে আরো রঙিন, আরো বর্ণিল। এই বর্ণিল উৎসবে যোগ দিতে আসা সবার প্রাণে থাকে বাংলাদেশ।

মজার ব্যাপার হলো, মেলা নিয়ে এই যে এত গল্পকথন বা তথ্য তুলে ধরা হলো তার একটা সরল ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যেতে পারে। তা হচ্ছে প্রতিটি মেলার আলাদা একটা বৈশিষ্ট্য আছে। আবার এসব মেলার আয়োজনের ক্ষেত্রেও আছে ভিন্নতা। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন একেক অঞ্চলে হয় একেকরকম মেলা। নতুন শতাব্দীর নতুন দৃশ্যপটে যুক্ত হয়েছে বৈচিত্র্যময় মেলার আয়োজন। সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে ঘুরে আসা যাক বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মেলা মাঠে।

যেমন– সাতক্ষীরায় আছে গুড়পুকুরের মেলা, বগুড়াতে মাঘী পূর্ণিমা মেলা, রাজশাহীর পুঠিয়ায় রথের মেলা, পাবনায় চড়কমেলা, সুন্দরবন দুবলাচরে রাসমেলা, নারায়ণগঞ্জে নাঙলবন্দ মেলা, কুষ্টিয়াতে লালন মেলা, কিশোরগঞ্জে চিলাইমেলা, মুন্সীগঞ্জে ভাগ্যকূল মেলা। পার্বত্য চট্টগ্রামে বিজুউৎসব মেলা, মানিকগঞ্জ ধামরাই রথের মেলা, চট্টগ্রামে মাইজভাণ্ডারি মেলা, জব্বারের বলি খেলা মেলা, সিরাজগঞ্জে বারুনি মেলা, যশোরের মধুমেলা, নেত্রকোনায় চণ্ডিগড় মেলা, নড়াইলে সুলতান মেলা, মৌলভীবাজারে রাশলীলার মেলা।

এখানেই শেষ নয়, মেলার আয়োজন আছেই। বাহারি পণ্যের যোগান দিতে অঞ্চলভেদে মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। এসব মেলা একেক জেলায় একেক নামে। তবে মেলার চরিত্র অনেকটাই একরকম। এসব মেলার পণ্য সামগ্রীর মধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসই অধিক পরিমাণে ক্রেতাদের চাহিদা পূরণ করে। প্রতিটি মেলাতেই মাটির হাঁড়ি, পাতিল, কলসি, বাসন-কোসন,

মালসা, সরা, ঘটি-বাটি, শিশুদের খেলনা সামগ্রী– রং-বেরঙের হাতি, ঘোড়া, নৌকা, পুতুলের পসরা থাকে। কাঠের সামগ্রীর মধ্যে থাকে লাঙল-জোয়াল, মই, খাট-পালং, আলমিরা, চেয়ার-টেবিল, সিন্দুক থেকে খাদা, খাঞ্চা, পিঁড়ি, বেলনা, খাদি, বাতিদানি, ডালঘুটনি, কাঁকই, লাটাই, লাটিম, খড়ম। বাঁশ-বেতের উপকরণগুলোর মধ্যে আছে ধামা, কুলা, ডালা, টুকরি, সরপোশ, পাখির খাঁচা, ভেলকি, দরমা, চাটাই, খালই, চাটি-পাটি হরেক রকম বাঁশি ইত্যাদি। লোহার সামগ্রী নিয়ে বসে দা, বটি, খন্তা, কড়াই, কুপুল, লাঙলের ফাল, হাতা, বেড়ি, তাওয়া, জাঁতি। বিভিন্ন ধরনের হাত পাখা, পাখির প্রতিকৃতি ও খেলনা পুতুলের বিচিত্র সামগ্রী পাওয়া যায় মেলায়। মণ্ডা, মিঠাই, জিলাপি, তক্তি, নাড়ু, চিড়ে, মুড়ি, মুড়কি, বাতাসা, ছাঁটে তৈরি চিনির হাতি, ঘোড়া, বাঘ, পাখি, মন্দির ইত্যাদি। শঙ্খ ও ঝিনুকের শাঁখা, বালা, আংটি, অনন্ত বাজু, চুড়ি, কান ও নাকের ফুল পাওয়া যায় এসব মেলায়। সাজসজ্জার উপকরণ তো থাকবেই যেমন– কাচের চুড়ি, আয়না, চিরুনি, সেইসঙ্গে নকল ধাতবের প্রচুর গহনা। এছাড়াও মৌসুমী ফলমূলের সমাহারে মেলা উপচে পড়ে।

ফলমূলের মধ্যে মৌসুমি অনুযায়ী– আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, আতাফল, আনারস, ডালিম, পেয়ারা, ফুটি, বাঙ্গি, কলা-নারকেল, বুচি, তালশাঁস, বরই, শশা, খিরাই ইত্যাদি নিয়ে মেলায় অংশগ্রহণ করে।

ঢাকায় প্রচলিত ঐতিহাসিক একটা মেলার নাম ঈদমেলা। পুরনো ঢাকার বাসিন্দারা এই মেলার আয়োজন করে থাকে। বুড়িগঙ্গায় থাকতো নৌকাবাইচ, আকাশে চলত রঙিন ঘুড়ির খেলা আর বাহারি পণ্যের পসরা। তবে ঢাকার ঈদমেলা আরেকটি আকর্ষণ হচ্ছে রঙিন শরবত। ঘোড়ার গাড়ি চেপে বড়োদের হাত ধরে শিশু-কিশোররা এই মেলার আনন্দের ঝিলিক ছড়িয়ে দিত। দিন বদলের ইতিহাসে ঢাকার মেলার এই চেহারা না থাকলেও এখনো মেলাগুলো হয় অতীতের আবহ নিয়ে।

নতুন দিনের নতুন মেলা

দিন বদলে যায়। যুগের হাওয়ায় যুক্ত হয় নতুন নতুন উপকরণের মেলা। চিরচেনা মেলার পাশাপাশি মনকাড়া আয়োজন নিয়ে একমাসব্যাপী বাংলা একাডেমিতে হয় অমর একুশে গ্রন্থমেলা। সময়ের পথপরিক্রমায় আরো যুক্ত হয়েছে বৃক্ষমেলা, মোবাইল মেলা, ফার্নিচার মেলা, পোশাক মেলা, চাকরি মেলা, বাউল মেলা, কৃষিমেলা, কম্পিউটার মেলা।

গ্রামীণ ঐতিহ্য, ধর্মীয় ও লৌকিক উৎসবের আয়োজন নিয়ে মেলা শহরেই হোক কিংবা গ্রামেই হোক লোকজ সংস্কৃতির সঙ্গে ভর করেই এই মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। তবে সব মেলার সেরা মেলা হিসেবে হৃদয়ে সুখ স্মৃতি জমা করে দেয় বৈশাখি মেলা। সারা দেশের মানুষ এই বৈশাখি মেলাকে ঘিরে সাধ্যমতো সাজিয়ে তোলে নিজেকে। উৎসবের আমেজে রাঙিয়ে তোলে। পান্তা-ইলিশের শহুরে সংস্কৃতি এখন গ্রাম পর্যন্তও ছড়িয়ে পড়েছে। বৈশাখি মেলার চিরন্তন চেনা রূপ মিশে আছে রবীন্দ্রনাথের 'এসো হে বৈশাখ এসো এসো' গানের সুরে। আর এই সুরে সুরে জেগে থাকুক বাংলাদেশের গান। বাংলাদেশের কবিতা। জেগে থাকুক বাংলাদেশের মানুষের আনন্দ-উৎসবের মিলনমেলা। হৃদয়ে অনুভূত হোক বাংলাদেশের ছবি।

বাংলাদেশের গাছ। গাছের সবুজপাতা। পাতার ওপর চাঁদ।
চাঁদ ছড়ানো আলো।
সেই আলোটা গায়ে মেখে আমরা থাকি ভালো।
বাংলাদেশের মাটি। মাটির বুকে ঘাস। ঘাসের ডগায় রোদ
রৌদ্র জ্বলা ঘামে
স্বপ্ন-আশার বীজ ছড়িয়ে কৃষক ক্ষেতে নামে।
বাংলাদেশের নদী। নদীর বুকে ঢেউ। ঢেউ কাটিয়ে নাও
চলছে দূরের ঘাটে
ঘাটের পাশেই জমলো মেলা বটতলারই হাটে।
বাংলাদেশে মেলা। মেলায় নাগরদোলা। নাগরদোলার তালে
মেলায় বাজে বাঁশি
বাঁশির টানে পাগলা মনে মেলায় ছুটে আসি।
বাংলাদেশের ছবি। দেখল বাউল কবি। কবির কথায় গান।
গানের সুরে সুরে
বৈশাখ দেয় নতুন দোলা সবার হৃদয় জুড়ে। ■

শিশুসাহিত্যিক ও মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি

চৈত্রসংক্রান্তির মেলায়

আহসান হাবীব

মুহিতদের গ্রামে চৈত্রসংক্রান্তির মেলা নাকি খুব জমজমাট হয়। তাই বকুল ভাবল এবার সে ঠিক ওই মেলায় যাবেই যাবে। মুহিত প্রায়ই বলে তাদের মেলায় যেতে। মুহিত বকুলের মামাতো ভাই। একটু দূর সম্পর্কের মামা, তাতে কি, কাজিনতো। বাবা-মায়ের অনুমতি আগেই নেওয়া ছিল। তো ঠিক চৈত্রসংক্রান্তির আগের দিন সত্যি সত্যি বাসে করে গিয়ে হাজির হলো বকুল মুহিতদের বাসায়। মাত্র ৪ ঘণ্টার জার্নি।

মুহিত তো বকুলকে দেখে হতভম্ব!

-তুই! তাহলে সত্যি এলি আমাদের এখানে। মা দেখো কে এসেছে। মামি রান্না করছিলেন, বকুলকে দেখে খুশি হলেন।

-যা বকুলকে নিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে আয় খাবার দিচ্ছি।

হাত-মুখ ধুয়ে খেয়ে-দেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে দুজনে বেরুলো।

-মেলা কি শুরু হয়ে গেছে ? ওখানেই যাচ্ছি আমরা ?

-আরে না, মেলা শুরু হবে কাল সকালে একদিনের মেলা।

-মাত্র একদিনের মেলা?

-হ্যাঁ, চৈত্র মাস শেষ। বৈশাখ মাস শুরু হবে নতুন বাংলা বছরের তাই এটি বিদায়ী বছরের মেলা। খুব জমজমাট মেলা হয়।

যা হোক পরদিন সকালেই নাশতা খেয়ে দুজনে রওনা হলো চৈত্রসংক্রান্তির মেলায়। খুব দূরেও না আধা ঘণ্টা হেঁটেই তারা পৌঁছে গেল মেলা চত্বরে, বিশাল মেলা। কত কিছু পাওয়া যাচ্ছে । হাত পাখা থেকে শুরু করে মাটির নানারকম পুতুল, বাঁশ আর বেতের তৈজসপত্র কি নেই। আর খাবারের দোকানেরও অভাব নেই।

চিনির তৈরি কত রকম পুতুল যে আছে তার কোনো হিসাব নেই। বকুল কী কী কিনবে মনে মনে তার একটা লিস্ট করতে শুরু করল। প্রথমে ছোটো বোন তিন্নির জন্য একটা মাটির পুতুল কেনার সিদ্ধান্ত নিল বকুল। দামও বেশি না। একটা পুতুল দশ টাকা। পুতুলের পুরো সংসার কিনলে ২৫ টাকা। মানিব্যাগট-ার জন্য পকেটে হাত ঢোকালো। তারপরই প্রায় চেঁচিয়ে উঠল বকুল–

-স-সর্বনাশ

-কী হলো? মুহিত জানতে চায়

-আমার মানিব্যাগ নেই।

-কী বলিস?

-হ্যাঁ... নেই। পিকপকেট হয়েছে। বকুলের চিৎকার করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে হলো। এখন সে জিনিসপত্র কিনবে কীভাবে বাড়িতেই বা ফিরবে কীভাবে?

-ঘাবড়াস না... দেখি কী করা যায়। তুই এখানে দাঁড়া। বলে মুহিত ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল। একটু পরেই একজন বড়ো মানুষকে নিয়ে ফিরল। ' ইনি আবুল ভাই। এই মেলার একজন অর্গানাইজার, ভাইয়া ও ঢাকা থেকে এসেছে ওর মানিব্যাগ পিকপকেট হয়েছে এই মাত্র'।

-তাই নাকি কত টাকা ছিল?

-৫০০ টাকার একটা নোট আর কিছু খুচরো টাকা।

-চামড়ার মানিব্যাগ?

না রেক্সিনের, ঠিক মানিব্যাগ না তবে মানিব্যাগের মতোই দেখতে।

-হুম... দাঁড়াও দেখি কী করা যায়। বলে তিনি ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গেলেন। তারপর ঘণ্টাখানেক চলে গেল তার দেখা নেই। মুহিত বলল ' চল কিছু খেয়ে নেই। ঘাবড়াস না ঠিক তোর মানিব্যগ পাওয়া যাবে'

একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকতে যাবে দেখে ওই রেস্টুরেন্টে বসে আবুল ভাই আয়েশ করে জিলিপি খাচ্ছে। ওদের দেখে হাত নাড়লেন। ওরা এগিয়ে গেল।

-মানিব্যাগ পেয়েছেন আবুল ভাই?

-ও হ্যাঁ, পেয়েছি তো।

-কোথায়?

-আছে আছে বসো... জিলিপি খাও। এই এখানে আরো জিলিপি দাও। রেস্টুরেন্টের মালিক একটা প্লেটে আরো কিছু জিলিপি দিয়ে গেল। ওরা খেল। আবুল ভাই হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো। 'তোমরা বসো আমি মানিব্যাগটা নিয়ে আসি' বলে বের হয়ে গেলেন। ঘণ্টাখানেক বসার পরও আবুল ভাইয়ের দেখা মিলল না। ওরা কী করবে বুঝতে না পেরে দোকান থেকে বের হতে যাবে। দোকানি আটকালো।

-জিলিপির দাম কে দিবে?

-কেন আবুল ভাই দেননি?

-ওই লোকটা বিল দিবে? কী কও?

-কেন উনি এই মেলার অর্গানাইজার না?

-সে তো তিন বছর আগে একবার হইছিল তারপর টেকাপয়সা তছরুপ করছে দেইখা বাদ। এখনো বাটপারি কইরা বেড়ায়... বুজছি তোমগো ভরকি দিছে। দেও জিলিপির দাম ২৫ ট্যাকা।

ভাগ্যিস মুহিতের কাছে টাকা ছিল। জিলিপির দাম দিয়ে ওরা বাসার পথ ধরল। মুহিত ওই পুতুলের সেটটা গিফট করল বকুলকে। বকুল না না করেও নিল। সব শুনে মামি ৫০০ টাকা দিয়ে বকুলকে বললেন, মন খারাপ না করতে, এত ভিড়ের মধ্যে পিক পকেট তো হতেই পারে। বিকেলের বাসে ওকে উঠিয়ে দিল মুহিত। ঢাকায় ফিরতে ফিরতে রাত ৯টা-১০টা বাজবে। অবশ্য বাসস্ট্যান্ডের কাছেই ওদের বাসা, চিন্তার কিছু নেই। বকুল তো এখন বড়োই, নাইনে উঠবে।

বাসায় ফিরে মানিব্যাগ পিকপকেটের কথা কিছু বলল না। পুতুলের সেটটা ছোটোবোনকে দিতেই সে মহাখুশি। নিজের ঘরে ফিরে এসে ব্যাগ খুলে কাপড় বের করতে গিয়ে দেখে ব্যাগের ভিতর এক কোনায় মানিব্যাগটা, যেমন ছিল তেমনি আছে।■

কার্টুনিস্ট ও শিশুসাহিত্যিক

পহেলা বৈশাখের জন্মযাত্রা

মাহবুব রেজা

পহেলা বৈশাখ এলেই যে বাঙালি মনের আনন্দে সব দুঃখ-বেদনা ভুলে গিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়ে উৎসবে মেতে ওঠে– তার কারণ কী? কবে থেকে আমাদের এই অঞ্চলে শুরু হয়েছিল বৈশাখকে বরণ করে নেওয়ার এই উৎসব? কী কারণে পহেলা বৈশাখ আমাদের জীবনে নিত্য অনুষঙ্গ হয়ে পড়ল? এসব প্রশ্ন নিয়ে রয়েছে নানা মত– দ্বিমত, পক্ষে বিপক্ষে রয়েছে যুক্তিতর্ক আর ব্যাখ্যা।

ঐতিহাসিকরা বলেছেন, বাঙালিরা যে পহেলা বৈশাখে বাংলা নববর্ষ পালন করে তা আসলে আমাদের দেশে প্রচলিত বঙ্গাব্দ বা বাংলা সন মূলত ইসলামি হিজরি সনেরই একটি রূপ। একসময় ভারতে ইসলামি শাসনামলে সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো হিজরি পঞ্জিকা মেনে। মূল হিজরি পঞ্জিকা ছিল চান্দ্র মাসের উপর নির্ভরশীল। সৌর বৎসর ৩৬৫ দিন অন্যদিকে চান্দ্র বৎসর ৩৫৪ দিন। এর ফলে চান্দ্র বৎসর সৌর বৎসরের চেয়ে এগারো-বারো দিন কম হয়। দিনের তারতম্যের কারণে চান্দ্র বৎসরের ঋতুগুলো পরিবর্তনশীল। ফলে খাজনা আদায়

আর চাষাবাদের সময় নিয়ে তৈরি হলো সমস্যার।

ঐতিহাসিকরা বলছেন, ফসল চক্রে সৌরসনের রীতি মেনে চলার কারণে আদায়কৃত খাজনার হিসাব ও রাজকোষ মিলাতে তারতম্য আর গরমিল তৈরি হতো। প্রায় সময়ই দেখা যেত হিজরি সনের যে মাসে যে ফসলে খাজনা জমা হয়েছে সেই একই মাসে তিন-চার বছর পর অন্য ফসল জমা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, তিন বছর আগে মহররম মাসে আউশের ফসল আউশ ধান জমা হয়েছে (ঋতুভিত্তিক মাস শ্রাবণ)। তিন বছর পর মহররম মাস এসেছে ঋতুচক্রে আষাঢ়ে। তখন মহররম মাসে তিলের ফসলের খাজনা জমা হয়েছে। আবার হিজরি সনের মাস নির্দিষ্ট রেখে খাজনা আদায় করতে হলে কোনো কোনো সময় দেখা যেত তা ফসল বপনের সময়, কর্তনের সময় নয়। ফলে তখন তৈরি হলো এক অদ্ভুত পরিস্থিতির। সম্রাট আকবর সেই পরিস্থিতির কীভাবে সামাল দেওয়া যায় তা নিয়ে নতুন কিছু করার চিন্তা করতে লাগলেন।

খাজনা আদায়ের জন্য আকবর তখন তার দরবারের প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিদ আমির ফতুল্লাহ শিরাজীকে দায়িত্ব দিলেন এই সমস্যা সমাধানের। তখন শিরাজী অনেক সময় নিয়ে গবেষণা করে একটা সমাধান বের করলেন। তিনি ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ১০ বা ১১ই মার্চ থেকে 'তারিখ-এ-এলাহি' নামে নতুন এক বছর গণনা পদ্ধতি চালু করলেন। শিরাজীর প্রবর্তিত সে সন কৃষকদের কাছে 'ফসলি সন' নামে পরিচিত হয় পরে যা 'বাংলা সন' বা 'বঙ্গাব্দ' হিসেবে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়।

ঐতিহাসিকরা আরো বলছেন, ৯৯২ হিজরি মোতাবেক ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আকবর আনুষ্ঠানিকভাবে হিজরি সৌর বর্ষপঞ্জীর প্রচলন করলেও তিনি ঊনত্রিশ বছর পূর্বে তার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার বছর থেকে এ পঞ্জিকা প্রচলনের নির্দেশ দেন। সে অনুযায়ী, ৯৬৩ হিজরি সাল থেকে বঙ্গাব্দ গণনা শুরু হয়। ৯৬৩ হিজরি সালের মহররম মাস ছিল বাংলা বৈশাখ মাস-ফলে বৈশাখ মাসকেই বাংলা বর্ষপঞ্জির প্রথম মাস এবং পহেলা বৈশাখকে নববর্ষ হিসেবে ধার্য করা হয়।

এখানে একটি মজার বিষয় হলো, বাংলা সন জন্ম নেওয়ার সাথে সাথে এর বয়স এক লাফে হয়ে যায় ৯৬৩ বছর।

দুই

গবেষকরা তাদের গবেষণায় দেখিয়েছেন যে বাংলা সন এসেছে মূলত হিজরি সন থেকে। তারা বলছেন, রাসূলুল্লাহ সা.-এর হিজরত থেকেই এ পঞ্জিকার শুরু। ১৪১৫ বঙ্গাব্দ অর্থ রাসূলুল্লাহ সা.-এর হিজরতের পর ১৪১৫ বৎসর। ৯৬২ চান্দ্র বৎসর ও পরবর্তী ৪৫৩ বৎসর সৌর বৎসর। সৌর বৎসর চান্দ্র বৎসরের চেয়ে এগারো-বারো দিন বেশি হওয়ার ফলে প্রতি ৩০ বৎসরে চান্দ্র বৎসর সৌর বৎসরের চেয়ে এক বৎসর বেড়ে যায়।

গবেষকরা জানাচ্ছেন, সম্রাট আকবরের জ্যোতির্বিদ আমির ফতুল্লাহ শিরাজী যখন দায়িত্ব পেলেন তখন তিনি মাসের নামগুলো ধার নিয়েছিলেন ভারতীয় প্রাচীন সৌরঅব্দ 'শকাব্দ' থেকে।

গবেষকদের গবেষণা থেকে আরো জানা যায়, প্রাচীন এক নৃপতি শালীবাহনের প্রয়াণকে কেন্দ্র করে শকাব্দ সনের সূচনা হয়েছিল। গবেষকরা বলছেন, শকাব্দ সনের প্রচলন হয়েছিল খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৭৮ বছর পর। অর্থাৎ শকাব্দ নামের এই সনটি খ্রিষ্টাব্দের চেয়ে ৭৮ বছরের ছোটো। তবে শকাব্দে ব্যবহৃত মাসের বেশিরভাগই খ্রিস্টপূর্ব চার হাজার বছর আগে বিশেষ করে বৈদিক যুগে প্রাচীন জ্যোতির্বিদদের দেওয়া ২৭টি নক্ষত্রের নাম থেকে ধার করা। ২৭টি নক্ষত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– চিত্রা, বিশাখা, অশ্বিনী, পৌষী ইত্যাদি। আমাদের প্রাচীন শিল্প- সাহিত্যে এসব নক্ষত্রের নাম নিয়ে অনেক প্রচলিত মিথও রয়েছে। পুরাণ ভাষ্য দিচ্ছে, চিত্রাসহ মোট ২৭টি নক্ষত্র হচ্ছে দক্ষ প্রজাপতির সুন্দরী কন্যা।

প্রথমদিকে হিজরি সনে মাসের নামগুলো ছিল, ফারওয়ারদিন, খোরদাদ, তীর, মুরদাদ, শাহরিয়ার,

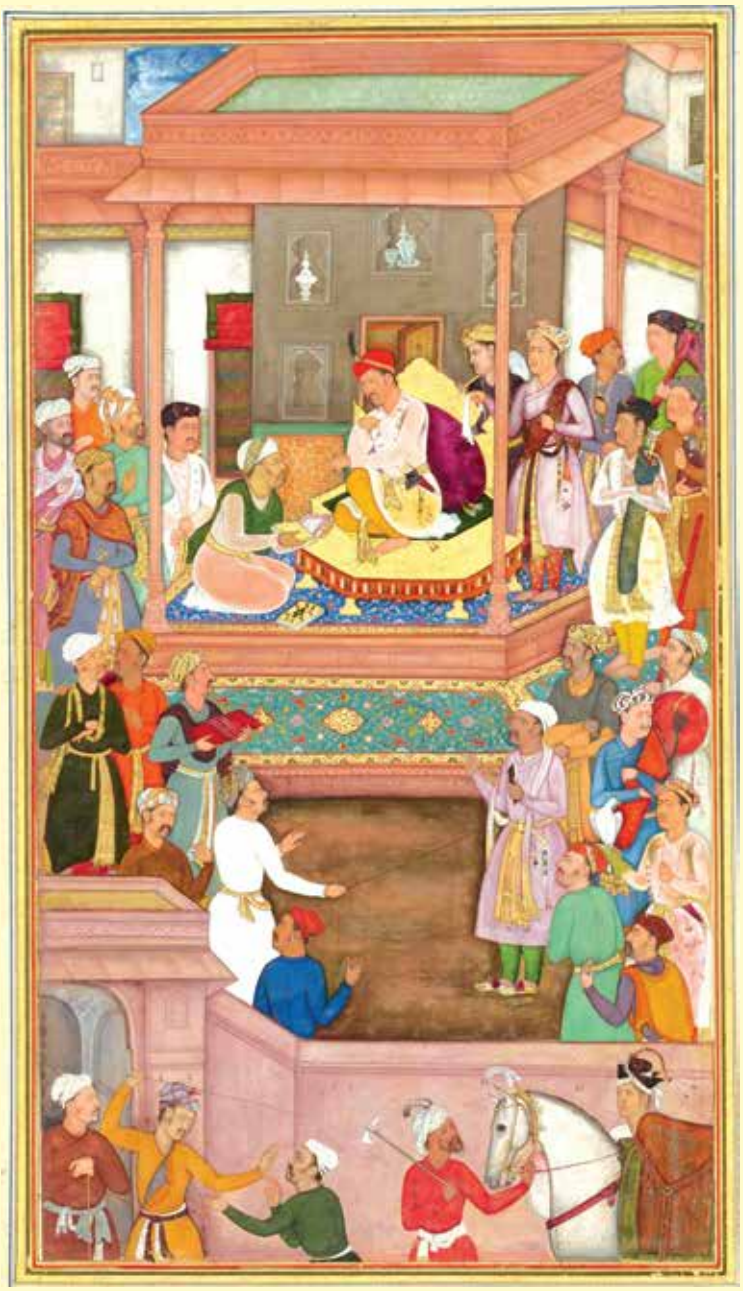

আবান, আযার, দে, বাহমান ইত্যাদি। মাসের এই নাম তদানীন্তন কালের মানুষের পক্ষে একটু কঠিনই ছিল। এ সমস্য নিরসনে এই মাসগুলোর নাম নাক্ষত্রিক নিয়মে বাংলা সনের মাসগুলোর নামকরণ করা হয়।

একদল গবেষক তাদের গবেষণায় বলছেন, ১২ মাসের নামগুলো নেওয়া হয়েছে ৭৮ খ্রিষ্টাব্দে সাকা জাতির রাজত্বের সময় প্রচলিত শকাব্দ থেকে। আরেকদল গবেষক বলছেন, প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থ 'সূর্যসিদ্ধান্ত' থেকে বাংলা সনের বারো মাসের নামকরণ করা হয়েছে। সেখানে উল্লেখ রয়েছে, বাংলা সনের মাসের নাম নেওয়া হয়েছে নক্ষত্রমণ্ডলে চন্দ্রের আবর্তনে তারাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে। যেমন: বৈশাখ নেওয়া হয়েছে বিশাখা নক্ষত্রের নাম অনুসারে।

একইভাবে জৈষ্ঠ্য নেওয়া হয়েছে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের নাম অনুসারে। আষাঢ় উত্তর ও পূর্ব আষাঢ়া নক্ষত্রের নাম অনুসারে। শ্রাবণ শ্রাবণা নক্ষত্রের নাম অনুসারে। ভাদ্র উত্তর ও পূর্ব ভাদ্রপদ নক্ষত্রের নাম অনুসারে। আশ্বিন আশ্বিনী নক্ষত্রের নাম অনুসারে। কার্ত্তিক কৃত্তিকা নক্ষত্রের নাম অনুসারে। অগ্রহায়ণ মৃগশিরা নক্ষত্রের নাম অনুসারে। পৌষ পুষ্যা নক্ষত্রের নাম অনুসারে। মাঘ মঘা নক্ষত্রের নাম অনুসারে। ফাল্গুন উত্তর ও পূর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্রের নাম অনুসারে। চৈত্র চিত্রা নক্ষত্রের নাম অনুসারে।

এ প্রসঙ্গে একটি পৌরাণিক উপাখ্যান প্রচলিত আছে– তা হলো, মহারাজা দক্ষ প্রজাপতির সাতাশজন পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। এই সাতাশজন কন্যা হলেন– আশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আদ্রা,

পুনর্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব-ফাল্গুনী, উত্তর-ফাল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মুলা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রাবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব ভদ্রপদা, উত্তর ভদ্রপদা এবং রেবতী। এই ২৭ কন্যার মধ্যে সবচেয়ে রূপবতী ছিলেন বিশাখা- যেমন রুপের গরিমা ছিল তাঁর তেমনি ছিল প্রচণ্ড মেজাজ, খরতাপের মেজাজ যাকে বলে। আমির ফতুল্লাহ শিরাজী করলেন কি এই বিশাখার নামকেই বেছে নিলেন বাংলা সনের প্রথম মাস হিসেবে। ভীষণ সুন্দরী কিন্তু খরতাপের মেজাজ সম্পন্ন বিশাখাই হয়ে গেল বৈশাখ। দক্ষ রাজা তার এইসব অনিন্দ্য সুন্দরী কন্যাদের কার সাথে বিয়ে দেবেন তা নিয়ে মহা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। রাজা তার মেয়েদের বিয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করতে লাগলেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তিনি তার মেয়েদের জন্য একমাত্র চন্দ্রদেবকেই পাত্র হিসেবে যোগ্য মনে করলেন। কিন্তু চন্দ্রদেবের চেয়ে ভালো পাত্র খুঁজে না পেয়ে রাজা শেষমেষ অনন্যোপায় হয়ে তার সাথেই সাতাশ কন্যার বিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। ফলে চন্দ্রদেবও পড়লেন অসুবিধায়। তার একার পক্ষে সাতাশ জন সুন্দরী স্ত্রীকে সামাল দেওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। তখন চন্দ্রদেব এক বুদ্ধি বের করলেন। চন্দ্রদেব স্থির করলেন, বারো রাশিচক্রের মধ্যে তিনি তার সাতাশ স্ত্রীকে এমনভাবে ঘর বেঁধে দেবেন যেন প্রতি মাসে অন্তত একবার করে তাদের প্রত্যেকের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেন। সময়ের পরম্পরায় আজও রাশিচক্র পাড়ি দিয়ে চন্দ্রদেব অর্থাৎ চাঁদ তার প্রিয়তমা সাতাশ পত্নির সাথে মাসে অন্তত একবার করে দেখা দিয়ে এসে তিন দিন বিশ্রাম করেন। চাঁদের এই রাশি পরিক্রমণকেই আমরা মাস নামে অভিহিত করি।

এখন প্রশ্ন, বাংলা সনের শেষ মাস চৈত্রের নামকরণ কোথা থেকে এসেছে?

জানা যায়, আমির ফতুল্লাহ শিরাজী এই চিত্রা নক্ষত্রের নাম অনুসারেই বাংলা সনের শেষ মাসের নাম রেখেছেন চৈত্র।

তিন

বৈশাখকে কেন বাংলা সনের প্রথম মাস হিসেবে গণনা করা হলো সে বিষয়েও অনেক গবেষক প্রশ্ন তুলে বলেছেন, যদি হিজরি সন মেনেই বঙ্গাব্দ সন চালু হয় তাহলে বৈশাখকে কেন বছরের প্রথম মাস হিসেবে গণনা করতে হলো?

এ প্রশ্নের যথাযথ ও বিজ্ঞানসম্মত উত্তর খুঁজতে হলে আমাদেরকে একটু পেছনে যেতে হবে। প্রাচীনকালে ভারতীয় উপমহাদেশে একেক অঞ্চলে একেক মাসে নববর্ষ উদযাপিত হতো। যেমন বৈদিক যুগে সম্ভবত নববর্ষ হতো অগ্রহায়ণ মাসে। অগ্র অর্থ হচ্ছে আগে আর হায়ণ মানে হচ্ছে বছর। অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মানে হচ্ছে বছরের শুরুর যে মাস। একইভাবে উত্তর ভারতে এখনও নববর্ষ পালিত হয় চৈত্র মাসের শুক্লা প্রতিপক্ষে। এক্ষেত্রে স্বনামধন্য লেখক শ্রী যোগেশচন্দ্র রায় মনে করছেন, অতি প্রাচীনকালে ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে নববর্ষোৎসবের অনুষ্ঠান হতো। বঙ্গাব্দ সনের শুরু বৈশাখ মাস দিয়ে এর কারণ যেদিন থেকে বঙ্গাব্দের গণনা শুরু হয়েছিল অর্থাৎ ৯৬৩ হিজরির প্রথম মাস জমাদিউল আওয়াল ছিল বৈশাখ মাসে। ■

সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

গল্প

মেলায় গেল তালপাতাটা

আহমেদ রিয়াজ

তালপাতায় এসে বসল একটা পাখি। নীলটুনি। আর অমনি দুলে ওঠল তালপাতাটা। জানতে চাইল, 'কোথায় যাচ্ছ গো নীলটুনি?'

নীলটুনি তো অবাক। কথা কয় কে? এদিক তাকালো। এদিকে ডুমুর গ্রাম। গ্রাম থেকে সরু রাস্তাটা তালগাছের নিচ দিয়ে ওদিকে গেছে। ওদিকে পাকুড়তলা। যদিও সবাই বটতলা বলে।

'কী নীলটুনি! কোথায় যাচ্ছ বললে না যে?'

'কথা কয় কে?'

'আমি গো আমি। তালপাতা। যার উপর তুমি বসে আছো।'

'ও!'

'তা যাচ্ছ কোথায়?'

'পাকুড়তলায়।'

অবাক হলো তালপাতা। 'পাকুড়তলায়? সেই সকাল থেকে সবাই দেখছি পাকুড়তলায় ছুটছে। কী আছে ওখানে?'

ছোট্ট করে জবাব দিলো নীলটুনি, 'মেলা।'

'মেলা!' চমকে ওঠল তালপাতা। 'কী আছে মেলায়?'

জবাব পেল না। কি করে পাবে? নীলটুনিটা ততক্ষণে পাকুড়তলার দিকে উড়াল দিয়েছে। সেই পথের দিকে তাকিয়ে রইল তালপাতা। তারপর ঘ্যান ঘ্যান শুরু করল, 'মা, আমি মেলায় যাবো। যেতে দেবে?'

দুপুরের কড়া রোদটুকু পাড়ি দিয়ে মা তালগাছ ক্লান্ত। এখন বিকেলের রোদটা কেবল গায়ে মাখতে শুরু করেছে। আরামে ঝিম এসে গিয়েছিল। হঠাৎ ঝিম ভাঙল, 'হুঁ!'

'আমি মেলায় যাবো। যেতে দেবে?'

আরামের ঝিমে বাধা পড়ায় মা তালগাছ বিরক্ত। বললেন, 'যা না! যা!'

বলেই আবার ঝিমুতে শুরু করে দিলো।

'যাবো!' খুশি হয়ে গেল তালাপাতা। 'যাচ্ছি।'

বলে যেই না রওনা দিতে চাইল, কিন্তু পারল না। কেন পারল না? কারণ ও একটা তালপাতা।

কি আর করা! তালপাতাটা পাকুড়তলার পথের দিকে তাকিয়ে রইল। অনেকেই মেলায় যাচ্ছে ওই পথ দিয়ে। কেউ দুপায়ে হেঁটে। কেউ চারপায়ে। কেউ আবার উড়াল দিয়ে। তবে উড়াল দিয়ে যারাই যায়, তাদের কেউ কেউ তালগাছে এসে বসে। খানিকটা জিরিয়ে নেয়।

এই যেমন এখন একটা কাক এসে বসল তালগাছে। বসেই হাঁক ছাড়ল, 'কা কা।'

তালপাতা শুনল, 'যা! যা!'। শুনেই বলল, 'যেতেই তো চাই। কিন্তু যেতে আর পারলাম কই?'

কাক বলল, 'কেন বাপু? কে তোমাকে আটকে রেখেছে? তোমার মা?'

'না।'

'তাহলে কে?'

'কেউ না।'

বিরক্ত হয়ে কাক বলল, 'তাহলে যাচ্ছ না কা?'

'কী করে যাবো?'

'এই আমার মতো এমনি পাখা মেলো। তারপর দাও উড়াল...'

বলেই উড়াল দিলো কাক। কোন দিকে?

কোন দিকে আবার। পাকুড়তলার দিকে! মেলা তো ওদিকেই।

আবার ঘ্যান ঘ্যান শুরু করল তালপাতা, 'মা আমার পাখা কোথায়?'

'পাখা দিয়ে কী করবি?'

'উড়ব। উড়ে উড়ে মেলায় যাবো।'
'তালাপাতাদের পাখা থাকে না।'
'তাহলে তোমার পাখাটাই দাও। মেলা থেকে এসে ফেরৎ দেবো।'
'তালগাছেরও পাখা থাকে না।'
'কেন থাকে না?'
'কারণ তালগাছ হচ্ছে গাছ। গাছেদের পাখা থাকে না। পাখা থাকে পাখিদের।'
'তুমি পাখি হলে না কেন?'
বিরক্ত হলেন মা গাছ। 'তোর মেলায় যাওয়ার শখ থাকলে যা না! বিরক্ত করছিস কেন?'
'তাহলে পা চারটেই ধার দাও। মেলা থেকে এসে ফেরত দেবো।'
'তালগাছের চারটে পা থাকে না।'
'ও, ওখানেও ঘাটতি? আচ্ছা, দুটো পা তো আছে! ওই দুটোই না হয় ধার দাও। কষ্ট করে দুপায়ে হেঁটেই মেলায় যাবো। দুপেয়েগুলো কেমন করে যে দুপায়ে হাঁটে!'
'তালগাছের দুটো পা-ও থাকে না।'
'বলো কি! দুটো পা-ও নেই!'
'দুটো কেন, একটাও নেই।'
দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ল তালপাতা। 'একটাও নেই!'
মা তালগাছ বললেন, 'না রে বাছা। একটা পা আছে। সেই পায়ের উপরই তো দাঁড়িয়ে আছি। আর আকাশে উঁকি মারছি। তুই বরং আকাশে উঁকি মার। মেলায় যাওয়ার দুঃখ ঘুচবে।'
বলেই ঘুম পাড়ানি সুরে গাইতে লাগলেন মা তালগাছ–

তালগাছ একপায়ে দাঁড়িয়ে
সব গাছ ছাড়িয়ে
উঁকি মারে আকাশে।

তারপর তাড়া দিলেন, 'নে, আকাশে উঁকি মারতে মারতে ঘুমিয়ে পড়। অন্ধকার তো হয়ে এল।'
সত্যি সত্যি অন্ধকার হয়ে আসছে। পাকুড়তলার পথের দিকে তাকালো তালপাতা। আরে! পথটা অনেক দূরে চলে গেল কীভাবে? এবার আকাশের দিকে উঁকি মারল। এ কী! আকাশটা এত কাছে এল কখন? আকাশের তারাগুলোকে মনে হচ্ছে ঝুনঝুনি।

ঝুনঝুন করে বাজছে। আর সেই ঝুনঝুন শব্দে ঘুমিয়ে গেল তালপাতা। আবার সেই ঝুনঝুন শব্দেই ঘুম ভাঙল ওর। আর ঘুম ভাঙতেই...

ঘুম ভাঙতেই ভীষণ অবাক হলো তালপাতা। সত্যি সত্যি একটা ঝুনঝুনি বাজছে ওর ঠিক সামনে। তালপাতা স্বপ্ন দেখছে না তো!

না তো! ওই তো দুপেয়েগুলো মেলায় ছুটে বেড়াচ্ছে। ও নিজেই তখন একটা দুপেয়ের হাতে। দুপেয়েটা ওকে দোলাচ্ছে। আর দোলাতে দোলাতে ছুটে এল খেলনার দোকানগুলোর দিকে। নানান রকম খেলনা। হরেক রকম পুতুল, মুখোশ, বেলুন, ঝুনঝুনি, ডুগডুগি, একতারা, বাঁশি। আরো অনেক খেলনা। সবগুলো দেখেও শেষ করতে পারল না ও। তার আগেই আবার ছুটল দুপেয়েটা। এবার খাবারের দোকানে। হরেক রকম খাবার। কদমা, জিলাপি, চানাচুর, খই, নিমকি, মুরালি, ঝিনুক পিঠা, চিড়া, মুড়ি, খই, নারকেলের চিড়া, তিলের নাড়ু, চিড়ার টফি, খেজুর পিঠা। আরো কত কি!

কিন্তু তালপাতাটা মেলায় এল কী করে? কারণ ও যে তখন একটা তালপাখা হয়ে গেছে!

তালপাতাটা কখন তালপাখা হয়ে গেছে টেরই পায়নি।■

শিশুসাহিত্যিক

পহেলা বৈশাখ

আফরোজা নাইচ রিমা

জাগ্রত হোক সকল ভালোবাসা এই নববর্ষের উজানে
ফিরে আসুক নব নব বার্তায় বাঙালির ঘর ভরে।
ভালোবাসার উজানে ভরুক বাঙালির বর্ষবরণ আয়োজন
রমণীরা রাঙাক লাল সাদায় নতুন আলোয় রঙিন।
পায়ের নূপুর ঘুঙুর ঘুঙুর, হাতে বাজুক বাজু-বালায়
চোখ জুড়াক আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা, শিশুর কোলাহলময়তায়।
লাল পাড়ে শাড়ি,গাঁদা ফুল আর কাজল কালো চোখে
আনন্দ উল্লাসে বৈশাখি মেলায় শিশুদের নিয়ে এসে।
ভেদাভেদ ভুলে যাক কৃষ্ণচূড়ার রং ছড়াক হৃদয়ে
রমনার বটমূলে পান্তা ইলিশ খেয়ে বৈশাখি মেলায় গিয়ে।
মান-অভিমান ভুলে খরা কাটুক বৈশাখির এই ঝড়ে
জরা-ক্লান্তি ধুয়ে মুছে যাক শুধুই ভালোবাসার উজানে।
এসো নবীন এসো প্রবীণ একই আকাশ তলে
উজান ভিড়ুক ভালোবাসার লাল-সবুজের বুকে।
নব-চেতনায় উদ্দীপ্ত হোক ভালোবাসাময় উজানের স্রোতে
ফিরে এসেছে পহেলা বৈশাখ বাঙালির ঘরে।

মেলার কথন

হাছিনা আক্তার

ছোট্ট বন্ধুরা, নববর্ষ হচ্ছে নতুন বছরের শুরু। পৃথিবীর সব জাতিই কোনো না কোনোভাবে নতুন বছর উদ্‌যাপন করে থাকে। প্রতিটি মানুষের প্রত্যাশাই থাকে নতুন বছর যেন তাদের জন্য শুভ্রতা ও মঙ্গল বারতা বয়ে নিয়ে আসে। বাংলাদেশে প্রতি বছর মহা ধুমধামে উৎসবমুখর পরিবেশে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপিত হয়। বৈশাখি উৎসবে থাকে প্রাণের ছোঁয়া, থাকে উচ্ছ্বাসের বাঁধভাঙা জোয়ার। অতীতের ভুলত্রুটি ও ব্যর্থতা ভুলে নতুন করে সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় উদ্‌যাপিত হয় বাঙালির নববর্ষ। শিশু-যুবা-বৃদ্ধসহ সব বয়সের সব শ্রেণির মানুষ এ দিনটি উদ্‌যাপন করে। বাংলা নববর্ষ বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রধান উপাদান। এ উৎসবের প্রধান অনুষঙ্গ বৈশাখি মেলা।

বন্ধুরা, আমরা সবাই জানি যে বাংলাদেশে নববর্ষ হিসেবে পালন করা হয় পয়লা বৈশাখকে। এটি আমাদের সর্বজনীন লোকউৎসব হিসেবে পরিচিত। আরবি হিজরি সনকে ভিত্তি করেই বাংলা সনের উৎপত্তি। মুঘল সম্রাট আকবরের (১৫৫৬-১৬০৫) আমলে বাংলার কৃষকদের সুবিধার্থে হিজরি সনকে ভিত্তি ধরে বাংলা সনের প্রবর্তন করা হয়। হিজরি সৌর বছর থেকে ১১ দিন ছোটো হওয়ায় এদেশের ঋতু পরিবর্তনের সাথে হিজরি বছরের মিল হয় না। এতে কৃষকদের ফসলি সন গণনায় সমস্যা হয়। কৃষকের কাছ থেকে জমিদারের খাজনা আদায়েও সমস্যা দেখা দেয়। কৃষকের সমস্যা দূর করতে এবং জমির খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে ১৫৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর থেকে হিজরি, চন্দ্রাসন ও ইংরেজি সৌরসনকে ভিত্তি করে বাংলা সন প্রবর্তিত হয়। নতুন সনটি প্রথমে ফসলি সন নামে পরিচিত থাকলেও পরবর্তী সময়ে তা বঙ্গাব্দ নামে পরিচিতি পায়। তাই বলা যায়, বাংলা নববর্ষ যেহেতু সম্রাট আকবরের সময় থেকে পালন করা হতো এবং সে

সময় বাংলার কৃষকেরা চৈত্র মাসের শেষ দিন পর্যন্ত জমিদার, তালুকদার এবং অন্যান্য ভূস্বামীদের খাজনা পরিশোধ করত। এ উপলক্ষ্যে তখন মেলা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। পরবর্তী সময়ে বৈশাখ উপলক্ষ্যে যে মেলার আয়োজন করা হতো, সে মেলাকে 'বৈশাখি মেলা' নামে নামকরণ করা হয়। সুতরাং বৈশাখি মেলার সূচনার সঠিক তারিখ নির্ধারিত করা না গেলেও এ মেলা যে বাংলা বঙ্গাব্দ পালনের সূচনা থেকেই সূচিত হয়েছে তাতে সন্দেহ থাকার খুব বেশি অবকাশ নাই। এমন অনেক স্থান রয়েছে, যেখানে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বৈশাখি মেলা বসছে এবং সেসব স্থান দেশবাসীর কাছে বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে।

বৈশাখি মেলা মূলত সর্বজনীন লোকজ মেলা হিসেবে স্বীকৃত। আনন্দ দেওয়ার জন্য মেলায় সব আয়োজনের মধ্যে স্থানীয় কৃষিজাত দ্রব্য কারুপণ্য, লোকশিল্পজাত পণ্য, কুটির শিল্পজাতসামগ্রী, সব রকম হস্তশিল্পজাত ও মৃৎশিল্পজাত সামগ্রী পাওয়া যায়। এছাড়াও শিশু-কিশোরদের খেলনা, সাজসজ্জার সামগ্রী এবং বিভিন্ন লোকজ খাদ্যদ্রব্য চিড়া, মুড়ি-মুড়কি, খই, বাতাসা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার মিষ্টিসহ বৈচিত্র্যময় খাবারের সমারোহ থাকে। সাথে থাকে পান্তা-ইলিশের আয়োজন। মেলায় বিনোদনের জন্য যাত্রা বিভিন্ন ধরনের লোকসংগীতের আয়োজন করা হয়। লাইলী-মজনু, ইউসুফ-জুলেখা, রাধা-কৃষ্ণের কাহিনি, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, নাটক, পুতুলনাচ, নাগরদোলা, সার্কাস ইত্যাদি থাকে বৈশাখি মেলার বিশেষ আকর্ষণ।

হাজার বছরের বাঙালিত্বের নিদর্শন বৈশাখি মেলা। শহরাঞ্চলে নগর সংস্কৃতির আমেজে বৈশাখি মেলা বসে। এ মেলায় বাঙালি খুঁজে পায় তাদের জাতিসত্তার উৎস। পয়লা বৈশাখে মেলার আয়োজন ছাড়া যেন বাঙালিত্ব পূর্ণতাই পায় না। দিন, মাসের অপেক্ষা শেষে যখন বাঙালির দোরগোড়ায় পয়লা বৈশাখ এবং বৈশাখি মেলা উপস্থিত হয় তখন বাঙালির চেয়ে খুশি আর বুঝি কোনো জাতি থাকে না। সব অশুভ তৎপরতা কাটিয়ে বাঙালির বৈশাখি মেলা আরো লাখো বছর বেঁচে থাকুক তার স্বতন্ত্র ঐতিহ্য নিয়ে। আমাদের ছোট্ট বন্ধুদের মনেও যেন এ আনন্দ ঐতিহ্য অম্লান থাকে। ■

পরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর

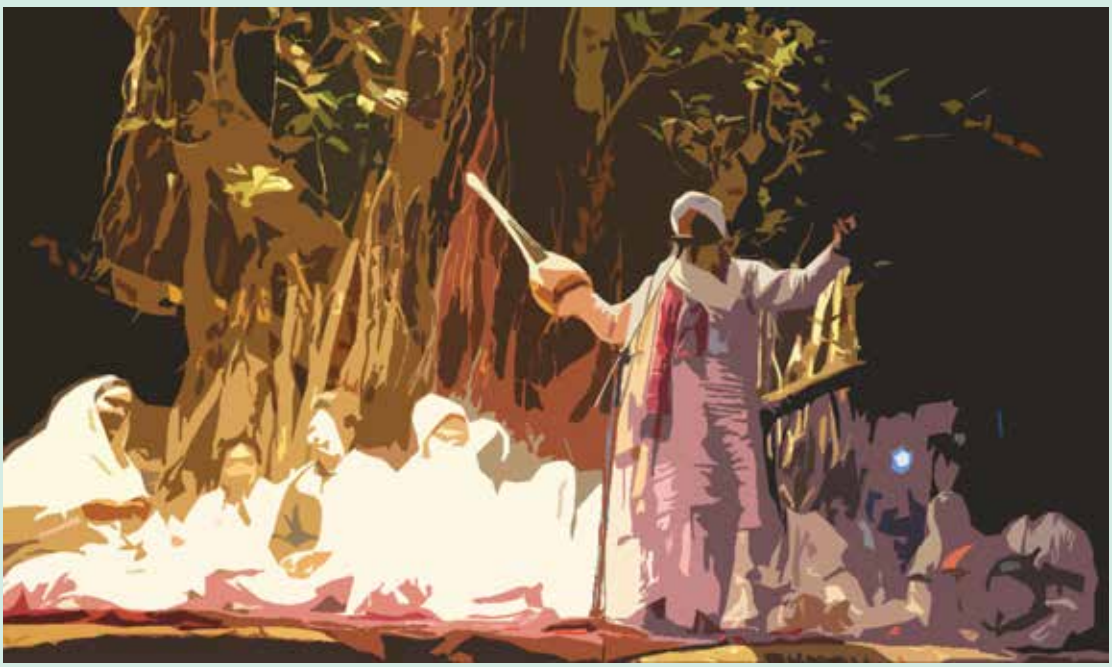

বৈশাখের নানা আয়োজন

শামস্ নূর

নববর্ষ, বাংলা নববর্ষ। বাঙালির জাতীয় জীবনের আবহমান সংস্কৃতির অংশ। আমাদের সংস্কৃতিতে প্রতি বছর পহেলা বৈশাখ নিয়ে আসে নতুনের বার্তা, যা নব নবরূপে একাত্ম হয়ে বিশেষ কৃষ্টির মহিমায় রূপায়িত হয়। জাতিধর্মনির্বিশেষে এ দিনটি বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। বাঙালি জাতি নিজ মেধা, মনন ও চিন্তা দিয়ে উৎসবমুখর পরিবেশে পালন করে নববর্ষের নানা অনুষ্ঠান।

জ্ঞানবিজ্ঞান, মানস ভাবনা, সাহিত্য-সংগীত, নৃত্য-চিত্র ও চারুকলায় প্রতিফলিত হয় নববর্ষের ভাবনা। পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। এর শিকড় মানুষের অন্তরে প্রথিত, যা শঙ্কর জনগোষ্ঠীর শ্রম ও উৎপাদননির্ভর কর্মকাণ্ডের ফসল। আমাদের প্রবাহমান ঐতিহ্যে আমরা লাভ করেছি পহেলা বৈশাখ। এর মাধ্যমে প্রকাশ পায় বাঙালির নিজস্ব সত্তা ও স্বকীয়তা। বৈশাখ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যে কয়েকটির সম্পর্কে কিছু জেনে নেই।

বৈশাখি মেলা

বৈশাখি মেলা বা বৈশাখের মেলা হচ্ছে বাঙালির উৎসব। যা বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরেও আয়োজিত হয়। এটি সার্বজনীন উৎসব। ১৫৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর থেকে হিজরি, চন্দ্রাসন ও ইংরেজি সৌরসনকে ভিত্তি করে বাংলা সন প্রবর্তিত হয় বলে জানা যায়। নতুন এ সনটি প্রথমে ফসলি সন

নামে পরিচিত থাকলেও বঙ্গাব্দ হিসেবেই তা পরিচিতি পায়। বাংলা নববর্ষ সম্রাট আকবরের সময় থেকে পালন করা হতো। ওই সময় বাংলার কৃষকেরা চৈত্র মাসের শেষ দিন পর্যন্ত জমিদার, তালুকদার এবং অন্যান্য ভূস্বামীদের খাজনা পরিশোধ করত। মেলা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো এ উপলক্ষ্যে। পরবর্তী সময়ে বৈশাখ উপলক্ষ্যে যে মেলার আয়োজন করা হতো, সে মেলাকে 'বৈশাখি মেলা' নামে নামকরণ করা হয়।

অনেক জায়গায় কেবল পয়লা বৈশাখে বসে দিনব্যাপী এ মেলা। আবার কোনো কোনো জায়গায় বৈশাখ মাসের বিশেষ তারিখ ও বারে অনুষ্ঠিত হয় বৈশাখি মেলা।

বাংলার গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এ মেলা নববর্ষকে যেমন উৎসবমুখর করে তোলে, তেমনই প্রাণের সঞ্চার হয় আমাদের মনে। মেলায় পাওয়া যায় কারুপণ্য, কৃষিজাত দ্রব্য, লোকশিল্পজাত জিনিস, কুটিরশিল্পসামগ্রী, খেলনা, সজ্জাসামগ্রী, চিড়া, মুড়ি, খই, বাতাসা, চিনির সাজসহ নানা কিছু।

পান্তা ইলিশের প্রচলন

পহেলা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের কথাটি মাথায় এলেই মুখ দিয়ে অকপটে বেরিয়ে আসে পান্তা-ইলিশের আহারবিলাস। প্রভাতে ইলিশ ভাজা, মরিচ পোড়া, বেগুন ভাজা, আলু ভর্তা আর পান্তা ইলিশের ভোজ না হলে যেন বৈশাখের উদ্‌যাপনই ফিকে হয়ে আসে। যদিও বৈশাখের সঙ্গে পান্তা-ইলিশের প্রচলনের ইতিহাস খুব দীর্ঘ নয়।

তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, পান্তা-ইলিশের সূচনা হয় ১৯৮৩ সালে রমনার বটমূলে। রমনার বর্ষবরণ উৎসব এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার মঙ্গল শোভাযাত্রার সুবাদে প্রতিবারই ব্যাপক লোক সমাগম হয়। যদিও করোনা পরিস্থিতির জন্য সীমিত পরিসরে যে যার মতো বাসায় পান্তা-ইলিশের বৈশাখি আয়োজন ঠিকই করে আসছে।

আবহমানকাল থেকেই বাঙালি পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন করে আসছে মেলা, হালখাতাসহ নানাভাবে। দিনটিতে ঘরে ঘরে ভালো খাবারের

আয়োজনও নিয়মিত অনুষঙ্গ। তবে পান্তা কিংবা ইলিশ কখনোই পহেলা বৈশাখের অনুষঙ্গ ছিল না। এর প্রচলন নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে হয়।

হালখাতার প্রচলন

বাঙালির লোকসংস্কৃতির লালিত ঐতিহ্য পহেলা বৈশাখ। বঙ্গাব্দ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে নানা কর্মসূচির মধ্যে দোকানিরাও গ্রহণ করে বিভিন্ন পদক্ষেপ। ছোটো-বড়ো প্রতিটি দোকানে দোকানে দেখা যায় হালখাতার প্রস্তুতি। জানা যায়, পুরনো হিসাব-নিকাশ চুকে নতুন বছরে নতুন খাতায় নাম তোলাই হলো হালখাতা।

'হালখাতা' আবহমান বাংলার চিরায়ত সংস্কৃতি, যা পহেলা বৈশাখ থেকে শুরু হয়ে চলে পুরো মাস জুড়ে। বর্তমানে প্রযুক্তির ছোঁয়ায় বাংলা সনের প্রথম দিনে দোকানের হিসাব আনুষ্ঠানিক হালনাগাদের এ প্রক্রিয়ায় অনেকটা ভাটা পড়েছে। এক সময় দোকানে দোকানে খোলা হতো হালখাতা। প্লেটে করে মিষ্টি বিতরণ করা হতো দোকানে দোকানে। ক্রেতারা পুরোনো হিসাব পরিশোধ করতে আসতেন। দোকানিরাও ক্রেতাদের জন্য চা, মিষ্টি, সন্দেশসহ নানা আয়োজন করে রাখতেন। বর্তমানে হালখাতায় কিছুটা ভাটা পড়লেও শহরের চেয়ে গ্রামে এখনো এর প্রচলন বেশি।

গ্রামে কিংবা মফস্বলের দোকানে বাহারি ধরনের হালখাতার কার্ড বিক্রি হতে দেখা যায়। খরিদ্দারদের কাছ থেকে বকেয়া টাকা আদায়ের জন্য হালখাতার আয়োজন করা হয়ে থাকে। পহেলা বৈশাখে পুরনো বছরের হিসাব-নিকাশ শোধ করে দোকানিদের মিষ্টিমুখ করিয়ে ক্রেতাদের স্বাগত জানানোর আনন্দ অতুলনীয়, যা চলে বৈশাখ মাস জুড়েই।

মঙ্গল শোভাযাত্রা

প্রতি বছর বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনে আয়োজিত একটি নতুন বর্ষবরণ উৎসব। বিশ শতকের শেষভাগে বাংলাদেশের ঢাকা শহরে এটি প্রবর্তিত হয়। একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ উৎসব হিসেবে সারা দেশে এটি ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের শিক্ষার্থীদের আয়োজনে প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সহযোগিতায় প্রতি বছরই পহেলা বৈশাখে ঢাকা শহরের শাহবাগ-রমনা এলাকায় এই আনন্দ শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ঐক্য এবং একইসঙ্গে শান্তির বিজয় ও অপশক্তির অবসান কামনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনসটিটিউটের উদ্যোগে ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম আনন্দ শোভাযাত্রার প্রবর্তন হয়। ওই বছরই ঢাকাবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় এই আনন্দ শোভাযাত্রা। সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনসটিটিউটের শিক্ষক-শিক্ষার্থীগণ পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে এই আনন্দ শোভাযাত্রা বের করার উদ্যোগ প্রতি বছর অব্যাহত রাখে।

বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের আবেদনক্রমে ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর বাংলাদেশের 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' জাতিসংঘ সংস্থা ইউনেস্কোর মানবতার অধরা বা অস্পর্শনীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান লাভ করে।

নববর্ষ কেবল প্রাত্যহিকতার জন্য জীবন থেকে মুক্তির আর নতুন সম্ভাবনার বার্তা নিয়ে আসে না, বাঙালির জীবনে নববর্ষ আসে নানা অনুষ্ঠান আর উৎসবের আমেজ নিয়ে। এ উৎসবের মধ্য দিয়ে আমাদের সামষ্টিক ও মানবিক চেতনা আরো উজ্জীবিত হয়। পহেলা বৈশাখে বাংলার প্রতিটি ঘর মেতে ওঠে নতুন আনন্দে। বৈশাখি নগর জীবনেও বাংলা নববর্ষে জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন ও উৎসাহ উদযাপিত হয়। এ যেন বাংলার ইতিহাসের সাথে আধুনিকতার মেলবন্ধন। আর পহেলা বৈশাখের শুভক্ষণে নতুন বছরকে বরণের আয়োজনে সারা দেশ যেন এক আনন্দ মেলায় পরিণত হয়। নববর্ষে আমরা যেন ধর্ম-বর্ণ- গোত্রের উর্ধ্বে উঠে পারস্পরিক প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নির্মাণ করতে পারি সুন্দর সমাজ। ■

প্রাবন্ধিক ও গবেষক, বাংলা একাডেমি

মুড়ি মুড়কি খই

তারিক মনজুর

গ্রামে এবার খুব আনন্দ। এবার খুব বড়োসড়ো আকারে মেলা হবে। বৈশাখি মেলা। করোনার কারণে দুবছর তো মেলাই বসেনি। আর গত বছর মেলাটা ঠিক জমেনি। মেলার কথাটা প্রথমে শুনতে পায় বিনু। সে শুনেই খুশি খুশি গলায় নেহাকে ফোন করে, 'জানিস, নেহা, এ বছর বৈশাখি মেলা হবে।'

নেহা শুনে বলে, 'মেলা তো গত বছরও হলো। কিন্তু আর জমল কই?'

বিনু বলে, 'দেখিস এবার ঠিক জমবে। নাগরদোলা আসবে, খই-মুড়ি-বাতাসা বিক্রি হবে।'

'তোকে এসব কে বলল?' নেহা জানতে চায়।

'কেউ বলেনি, শুনেছি।' বিনু বলতে থাকে, 'বাবা কথা বলছিলেন কয়েকজনের সাথে। আমি পাশে দাঁড়িয়ে শুনেছি। তারপর না তোকে ফোন করলাম!'

বিনুর কাছ থেকে এরপর পিলটু আর অন্যরাও মেলার খবর পেয়ে যায়। এ-কান সে-কান হয়ে মেলার খবর ভাষা-দাদুর কানে গিয়ে পৌঁছালো। ভাষা-দাদু বললেন, 'মেলার আসল মজা কিন্তু ওই মুড়ি-মুড়কির মধ্যে লুকিয়ে। মুড়কি কি জানো তো?'

নদীর ধারে একটা বিশাল বটগাছ ছিল একসময়। সেই বটগাছের তলায় আগে মেলা বসত। এখন আর সেখানে কোনো বটগাছ নেই। কিন্তু এখনও সেখানেই মেলা হয়। বিকালবেলা সেখানে বসেই ভাষা-দাদুর সঙ্গে ওদের কথা হচ্ছিল। ভাষা-দাদুর প্রশ্ন শুনে বিনু বলে, 'মুড়কি মানে তো খই। তাই না, দাদু?'

দাদু হাসেন। বলেন, 'আর কেউ কিছু বলতে চাও?'

নেহা বলে, 'দাদু, উড়কি ধানের মুড়কি হয়। তাই না? কবিতায় পড়েছি – উড়কি ধানের মুড়কি ভাজে...'

পিলটু বলল, 'মুড়ি আর মুড়কির মধ্যে পার্থক্য কী দাদু? মুড়কি মানে কি আসলেই খই?'

ভাষা-দাদু হাসেন। বলেন, 'একসময়ে মুড়ি, মুড়কি, খই এগুলো চিনিয়ে দিতে হতো না। দেশের সব ছেলে-মেয়েই এগুলো চিনত। এখন শহরের ছেলে-মেয়েদের অনেকে খই চেনে না। আর তোমরা দেখছি মুড়কিও ঠিকমতো চেনো না।'

'চিনি না, তো চিনিয়ে দাও!' বিনু খোঁচা দিয়ে বলে।

ভাষা-দাদু বলেন, 'মুড়ি তো সবাই চেনো। আর মুড়ি কীভাবে ভাজা হয়, তাও দেখেছ নিশ্চয়ই। গরম বালিতে চাল ফেলে মুড়ি বানানো হয়। সবচেয়ে ভালো হয়, মুড়ি বানানোর চাল যদি আগে ধুয়ে

শুকিয়ে নেওয়া হয়।'

'দাদু, খইও তো একইভাবে বানানো হয়।' বিনু বলে, 'খই বানানোর জন্যও তো বালি লাগে।'

'হ্যাঁ, বালি লাগে। তবে, মুড়ি বানানো হয় চাল দিয়ে, আর খই বানানো হয় ধান দিয়ে। মাটির খোলায় বা পাত্রে আগে বালি গরম করে নেওয়া হয়। তারপর শুকনা ধান সেই গরম বালিতে রেখে ঝাড়ুর কাঠি দিয়ে নাড়াচাড়া করলে খই ফুটে বেরুতে থাকে।'

পিলটু বলে, 'দাদু, খই বানানো আমি দেখেছি। সাদা রঙের খই পটপট করে ধান থেকে ফুটে বের হয়।'

'খইয়ের রং সাদা বলতে আমার কিছু আপত্তি আছে।' ভাষা-দাদু বলেন, 'আমরা যখন বলি খই-রঙা হাঁস, তখন ঠিক সাদা রঙের হাঁস বোঝাই না। কোনো কোনো সাদা হাঁসের গায়ে মাঝে মাঝে বাদামি-কালো দাগ দেখা যায়। সেই হাঁসকে খই-রঙা হাঁস বলা যায়।'

বিনু বলে, 'দাদু, খইয়ের গায়েও বাদামি-কালো একটু একটু দাগ দেখা যায়। এই কারণে?'

'অন্য কে কী বলল, তা জানি না। তবে আমার এমনটাই মনে হয়।' ভাষা-দাদু বলেন।

পিলটু খই বানানো দেখেছে। সেই কথার সূত্রে সে বলতে থাকে, 'দাদু, খই ফোটা দেখতেও খুব মজার। একবার ফোটা শুরু করলে পটপট করে ফুটতেই থাকে।'

ভাষা-দাদু বলেন, 'ঠিক এই কারণেই কেউ যদি খুব পটপট করে কথা বলতে থাকে, তখন বলা হয়, মুখে যেন খই ফুটেছে।'

নেহা ব্যাকরণে ভালো। বলে, 'দাদু, আরেকটা কথা আছে না, মুড়ি-মুড়কির এক দর? এই কথার মানে কী?'

ভাষা-দাদু বলেন, 'মুড়কি কী, এটা জানলে

মুড়ি-মুড়কির এক দর– এই কথাটাও বুঝতে পারতে।'

বিনু বলে, 'মুড়কি কী, তাহলে তুমিই বলে দাও না!'

'মুড়কি হলো গুড় মাখানো খই।' ভাষা-দাদু রহস্য না করে জানিয়ে দেন।

নেহা বলে, 'ও বুঝেছি। খই আর গুড় মাখানো খইয়ের তো এক দাম হতে পারে না।'

ভাষা-দাদু বলেন, 'একইভাবে কোনো সমাজে জ্ঞানী-গুণী লোক আর খারাপ লোকের মূল্য সমান হতে পারে না। যখনই দুটি ভিন্ন জিনিস সমানভাবে মূল্যায়ন করা হয়, তখন দুঃখ করে বলা হয়, এ তো দেখছি মুড়ি-মুড়কির এক দর!'

'দাদু, মুড়ি, মুড়কি, খই – এসব শব্দ কেমন করে তৈরি হলো বলতে পারো?'

'সবগুলো ঠিক বলতে পারব না। তবে কাছাকাছি বলতে পারব। অভিধান দেখে তোমরা আরেকটু মিলিয়ে নিও।'

'কিন্তু দাদু, একটা শব্দ কীভাবে এল, সেটা তো অভিধানে প্রায় ক্ষেত্রেই দেওয়া থাকে না।' নেহা বলে।

'এটা ঠিক, অভিধানে সব শব্দের উৎস দেওয়া থাকে না।' ভাষা-দাদু বলতে থাকেন, 'সব শব্দের উৎস আসলে পাওয়া যায় না। তাছাড়া কিছু কিছু উৎস মানুষ ধারণা করে নিয়েছে মাত্র। যেমন, মুড়ির ব্যাপারটাই ধরো। মুড়ি যখন ভাজা হয়, তখন মুড়মুড় করে শব্দ হয়। সেই মুড়মুড় শব্দ থেকে মুড়ি শব্দটা এসে থাকবে।'

'কী বলো, দাদু!' বিনু ও পিলটু একসাথে চমকে ওঠে। নেহাও অবাক চোখে ভাষা-দাদুর দিকে তাকায়।

বিনু বলে, 'আর খই ভাজার সময়ে খইখই করে শব্দ হয় নাকি?'

ভাষা-দাদু হাসেন। বলেন, 'এটার উৎস ধরা হয় সংস্কৃত। সংস্কৃত শব্দ খদিকা থেকে খই হয়েছে।'

'খদিকা থেকেই খই?' পিলটু অবাক হয়, 'এমন শব্দ তো আগে শুনিনি।'

দাদু বলেন, 'বাংলাতে আমরা খদিকা ব্যবহার করি না। কারণ, বহু আগে থেকেই খদিকা শব্দটি আমাদের মুখের উচ্চারণে পালটে গিয়ে খইয়া হয়ে গেছে। পরে সেই খইয়া থেকে খই শব্দটি এসেছে।'

'আর মুড়কি?' নেহা প্রশ্ন করে।

ভাষা-দাদু বলেন, 'মুড়কি সম্পর্কে আমি ঠিক বলতে পারব না। বললাম না, শব্দের উৎসের অনেকটুকু আমাদের অনুমান করে নিতে হয়েছে।'

'তা মুড়কি সম্পর্কে তোমার কোনো অনুমান আছে, দাদু?' বিনু বলে।

'খইয়ে গুড় মোড়ানো হয় বা মাখানো হয়। আমার ধারণা, এই মোড়ানো থেকে মুড়কি হতে পারে।' ভাষা-দাদু বলেন।

'শব্দের উৎসের ব্যাপারটা তো ভারি মজার!' পিলটু বলে, 'এর মধ্যেও খানিক বিজ্ঞান দেখতে পাচ্ছি।'

'এটাকে অর্থবিজ্ঞান বা শব্দার্থবিজ্ঞান বলতে পারো।' ভাষা-দাদু বলেন। তবে, মেলা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে মেলা কথা হয়ে গেল।'

বিনু হাসে। বলে, 'দাদু, এই মেলা শব্দটা আবার কোত্থেকে এল?'

নেহা বলে, 'এটা আমি জানি, দাদু। সব মানুষ এক জায়গায় মেলে বা মিলিত হয়। এখান থেকে মেলা শব্দটি তৈরি হয়েছে। তাই না?'

'হ্যাঁ, তাই। আপাতত চলো, বাড়ি যাই। আর যখন মেলা বসবে, তখন না হয় দিনে দুবার করে আসা যাবে!' দাদু উঠতে উঠতে বলেন।

'হ্যাঁ, চলো দাদু। তখন কিন্তু মেলা থেকে আমাদের মুড়ি, মুড়কি, খই কিনে দিতে হবে তোমাকে!' বিনু আবদার করে বলে।

বিনুর কথা শুনে পিলটু হি হি করে হাসতে থাকে। ■

সহযোগী অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মেলায় যাইরে কিছু খাইরে

রাজিউর রহমান

আমাদের দেশে বছরের অধিকাংশ সময়ে উৎসব-আয়োজন-আনন্দ লেগেই থাকে। অঞ্চলভেদে একেক সময়ে একেক ধরনের উৎসব হয়। ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সবাই এসব উৎসবে অংশ নেয়। সর্বজনীন উৎসবগুলোর প্রতিটির সঙ্গে মিশে আছে বাংলা সংস্কৃতির শেকড়ের গল্প। হাজার বছরের সংস্কৃতির ঐতিহ্যে রকমারি খাবারেও বাঙালিয়ানায় বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়। মেলাও তেমনই ঐতিহ্যবাহী উৎসব। তাই মেলায় ঐতিহ্যবাহী বেশ কিছু সুস্বাদু খাবারের দেখা মেলে। খাবারের জন্যই মূলত মেলাগুলো প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে সব বয়সের মানুষের কাছে। বিশেষ করে মেলাগুলোতে পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণে মিষ্টিজাতীয় খাবার। যা আমাদের ঐতিহ্য বহন করে। এর বড়ো কারণ সম্ভবত ধর্মীয় সংস্কার। মেলায় কী কী খাবার আমরা খেতে পারি চলো দেখে নেই–

বাতাসা-খাগড়াই: বাতাসা ও খাগড়াই দুটিই খেতে মিষ্টি। তবে আকৃতির দিক থেকে এদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বাঙালির প্রিয় বাতাসা তৈরি হয় চিনি দিয়ে। খাগড়াইয়ের আকৃতি কিছুটা কদম ফুলের মতো। আকারে অনেক ছোটো হয়। এটাও চিনি দিয়ে তৈরি।

তবে এর ভেতরে থাকে মুড়ি বা খই। বছরের অন্য সময় খুব একটা দেখা যায় না, শুধু দেখা পাওয়া যায় মেলায়।

মুরলি: গুড়ের বা চিনির তৈরি মুরলি মেলার অন্যতম খাবার। অঞ্চলভেদে এর বিভিন্ন নাম আছে। কোথাও কোথাও এটির নাম খুরমা। আঙুলের মতো দেখতে বলে কোথাও এর নাম আঙুলি। মেলায় হলুদ, সাদা, লাল তিন রঙের মুরলি দেখা যায়।

জিলাপি: মেলার বড়ো আকর্ষণের নাম জিলাপি। গুড়ের জিলাপির একটা কদর সাথে চিনির জিলাপিও জনপ্রিয়। মেলায় ভাজা গরম জিলাপি খাওয়ার মজাই আলাদা।

কদমা: বাংলার একটি শুকনো মিষ্টি। অতিথি আপ্যায়নে কদমা দেওয়া পুরনো রীতি। সিলেট অঞ্চলে সাদা কদমাকে তিলুয়া বলা হয়।

চিনির তৈরি হাতি-ঘোড়া: মেলায় অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে চিনির তৈরি হাতি-ঘোড়াসহ বিভিন্ন প্রাণী রূপের তৈরি সাজ। এই খাবার না কিনলে মেলা যেন পরিপূর্ণ হয় না।

নিমকি: মেলা জুড়ে মিষ্টি পদের পাশে থাকে নোনতা নিমকিও। যারা মিষ্টি কম পছন্দ করেন নিমকি তাদেরই বেশি পছন্দের খাবার।

গজা: এক প্রকারের শুকনো মিষ্টি। সাধারণ মিষ্টি থেকে আকারে দীর্ঘ হয়ে থাকে বিধায় একে গজা বলে।

তিলের খাজা: তিল দিয়ে তৈরি এক প্রকার মিষ্টান্ন কিছুটা আঠালো ধরনের এই খাজার আকৃতি চ্যাপটা ও লম্বাটে ধরনের হয়। এর উপরে খোসা ছাড়ানো তিল মাখানো থাকে এবং ভেতরে খানিকটা ফাঁপা।

মোয়া: বাঙালির এক ঐতিহ্যবাহী খাবার হলো মুড়ি বা খই এর মোয়া। যখন নতুন ধান ঘরে আসে তখন গ্রামে মুড়ির মোয়াও তৈরি করা হয়। এটি খেতে বেশ মজা ও সুস্বাদু। মেলায় হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হলে মোয়া খেয়েই কিছুটা বিশ্রাম নেওয়া যায়।

বিন্নি ধানের খই: শতবর্ষের ঐতিহ্য বিন্নি ধানের খই একটি মুখরোচক সুস্বাদু খাবার। শিশু থেকে বৃদ্ধ সবারই পছন্দ। শীতের শুরু থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত মূলত বিন্নি ধানের খই ভাজার মৌসুম।

নকুলদানা: একপ্রকারের চিনির মিষ্টি। এটা ছোটো ছোটো বলের মতো দেখতে হয়। সাধারণত পূজার কাজে এটি ব্যবহৃত হয়। ভিতরে থাকে ডাবলি দানা।

শনপাপড়ি: এক প্রকার হালকা মিষ্টিজাতীয় খাদ্যদ্রব্য। দেখতে বাদামি বর্ণ এবং ওজনে হালকা, সুতার মতো মিহি। আটা, ডিম, দুধ, চিনি ও ঘিয়ের সংমিশ্রণে চুলের মতো মিহি ও সরু করে শনপাপড়ি তৈরি করা হয়।

এছাড়া অঞ্চলভেদে আরো অনেক খাবারই মেলায় পাওয়া যায়। শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে সব বয়সের মানুষের নজর কাড়ে মেলার নানা স্বাদের খাবার। মেলায় ঘুরে দেশীয় এসব খাবারের স্বাদ না নিয়ে ঘরে ফেরেন এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। ■

শিক্ষার্থী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

ছড়া-কবিতায় মেলা

মো. সিরাজুল ইসলাম

মেলার আক্ষরিক অর্থ মিলন। মেলা পরস্পরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ও ভাব-বিনিময়ের সংযোগ সেতু তৈরি করে। প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে বাংলাদেশের মেলা। কোনো দেব মন্দির প্রাঙ্গণে কিংবা নদী ও সমুদ্রোপকূলে কিংবা গ্রামের কোনো নির্দিষ্ট স্থানে কোনো উৎসব উপলক্ষ্যে সমবেত হয় অগণিত মানুষ। সেটাই মেলা নামে খ্যাত। মেলা– মিলন মেলা। বাংলায় নানা ধরনের ধর্মীয় আচার-প্রথা ও উৎসবের সূত্র ধরেই মেলার উৎপত্তি হয়েছে।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন,

'উৎসব প্রাঙ্গণের মুক্ত অঙ্গনে সকল গ্রামবাসীর মনের উচ্ছ্বসিত মিলনস্থল হইল মেলা'।

মেলায় অবাধ মেলামেশায় মনের প্রসারতা, এবং বেচাকেনার মধ্যে পারস্পরিক চেনা-জানা হয়। মেলাকে অবলম্বন করে আঞ্চলিক সংস্কৃতি বিকশিত হয়। সমস্ত মেলারই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রায় এক। যা বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাপনের সাথে মিশে আছে। আবহমানকালের বাংলায় চৈত্রসংক্রান্তি থেকে শুরু করে বারো মাসই মেলার আয়োজন হয়। আমরা ছোটোবেলা থেকে লোকগান শুনে আসছি, আর একটু বড়ো হলে শুনতাম, মেলায় যাইরে...।

সর্বজনীন লোকজ মেলা হলো বৈশাখি মেলা। বাংলা নতুন বছরের শুরুতে বাংলাদেশের সবখানেই আয়োজন করা হয় বৈশাখি মেলার। নববর্ষকে উৎসবমুখর করে তোলে এ বৈশাখি মেলা। স্থানীয় কৃষিজাত দ্রব্য, কারুপণ্য, লোকশিল্পজাত পণ্য, কুটির শিল্পজাত সামগ্রী, সব প্রকার হস্তশিল্পজাত ও মৃৎশিল্পজাত সামগ্রী এই মেলার মূল আকর্ষণ।

পিঠাপুলি তৈরি ও আয়োজনের উৎসব পৌষ মেলা। নবান্ন উৎসবকে কেন্দ্র করে কৃষকেরা ঘরে যে ফসল তোলে, পরবর্তী সময়ে তা দিয়ে বিভিন্ন স্বাদ, গন্ধ ও বৈচিত্র্যের পিঠাপুলি তৈরির মধ্য দিয়ে এ মেলা উদ্‌যাপিত হয়।

গ্রামের মেলা, শহরের মেলা, পৌষের মেলা, বৈশাখি মেলা-এমনিতর হাজারো মেলা জড়িয়ে আছে আমাদের জীবনে-সংস্কৃতিতে। আছে স্মৃতিতে। মেলার নানা আয়োজন আমাদেরকে যেমন আকৃষ্ট করে, তেমনি মেলা নিয়ে রচিত হয়েছে অনেক সাহিত্য উপকরণ। বাংলার প্রকৃতির সৌন্দর্য কিংবা ঋতুবৈচিত্র্য ছন্দময় হয়ে ওঠে কবিতায়। তেমনি মেলা নিয়ে শব্দের খেলা করেন কবিরা। ছেলেবেলা থেকে আমরা মেলা নিয়ে পড়েছি কতনা ছড়া কবিতা। যেগুলো মেলার মতোই আমাদের কাছে ভালো লাগার বিষয় হয়ে আছে। মনের মণিকোঠায় ঠাঁই করে নিয়েছে। বই-এর পাতা খুললেই আমরা ছন্দ-ছড়ায় মেলা দেখার স্বাদ পাই। সেরকমই কিছু ছড়া-কবিতার কথা জানাবো তোমাদের।

'পৌষমেলা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) শীতের মেলার এক অনুপম চিত্র এঁকেছেন। অকাল বর্ষণে পথ পিচ্ছিল হয়ে গেছে। মেলা থেকে ফিরবার পথে পা পিছলে পড়ে কাচের চুড়ি,মাটির হাড়ি সব গেল ভেঙে। টাকা-কড়ি ব্যয়ে কেনা শখের জিনিস সব মাটিতে গেল মিশে। সকালের কাদা কেড়ে নিল বিকেলের সবটুকু সুখ। এ যেন আমাদের জীবনবাণী। শৈশবের ভালো লাগার সব বিসর্জন দিয়েই জীবনের পরিসমাপ্তি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর পৌষ-মেলা

শীতের দিনে নামল বাদল
বসল তবু মেলা।
বিকেল বেলায় ভিড় জমেছে ,
ভাঙল সকাল বেলা।
পথে দেখি দু-তিন-টুকরো
কাঁচের চুড়ি রাঙা,
তারি সঙ্গে চিত্র-করা
মাটির পাত্র ভাঙা।
সন্ধ্যা বেলার খুশিটুকু
সকাল বেলার কাঁদা
রইল হোথায় নীরব হয়ে,
কাঁদায় হল কাদা।
পয়সা দিয়ে কিনেছিল
মাটির যে ধনগুলা
সেইটুকু সুখ বিনি পয়সায়
ফিরিয়ে নিল ধূলা।

আমরা মেলায় যাই বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র কিনতে। মেলায় আসে তুলা, তামা, কাসা, মাটির তৈরি বিভিন্ন রকমের তৈজসপত্র। বিশেষ করে শিশুদের খেলনার জন্য মাটির তৈরি দুলদুল, ঘোড়া, টমটম ইত্যাদি সবারই নজর কাড়ে। গ্রামীণ কারুশিল্পীদের তৈরি অসংখ্য উপকরণ, হরেক রকমের খাদ্যসম্ভার, চিনির সাজ, কদমা, বাতাসা, বিন্নি খই, মুড়ি, ভ্রাম্যমাণ দোকানিদের নানারকমের পণ্যসামগ্রী মেলায় উৎসবের আমেজ নিয়ে আসে।

মহাদেব সাহা (১৯৪৪) তাঁর 'এই গৃহ এই সন্যাস' কবিতায় মেলা থেকে শাড়ি-চুড়ি কেনার কথা বলেছেন। বলেছেন, মেলা থেকে কেনাকাটা করে ফিরে আমরা ঘরেই যেন মেলা বসাই।

...দিব্যি সবাই সময়মতো মেলায় যায়, ছেলেমেয়েদের হাতে দেয় লজেন্স বা মেলার মিঠাই-বউঝির জন্যে নিয়ে আসে ডুড়ে শাড়ি, পছন্দমতো নানান মাপের চুড়ি, মেলার আনন্দ তারা লুটে ঘরে নিয়ে আসে, মেলা থেকে ফিরে এসে যেন ঘরে তারা মেলা বসায়...।

সাম্প্রতিককালের তরুণ কবি আর ছড়াকারদের রচনায় রয়েছে মেলা নিয়ে বিচিত্র স্বাদের লেখালেখি। মেলা আমাদের খুশির বন্যায় ভাসিয়ে দেয়। মেলায় যেতে নতুন পোশাকে সাজি। কী কী দেখব,তার অপেক্ষায় থাকি। মণিকাঞ্চন ঘোষের বৈশাখি ছড়া নতুন খুশির বীণ এসো পড়ি।

বছর ঘুরে আবার এল
বৈশাখের এই দিন;
খোকা খুকুর মনে বাজে
নতুন খুশির বীণ।
নতুন জামা কাপড় পরে
মেলায় যাবে আজকে ;
নতুন করে এলে বৈশাখ
কে ভোলে তার সাজকে?
মেলায় আছে হাতি-ঘোড়া
রঙ বাহারি দোলনা;
বন্ধুরা সব কোথায় গেলি
চোখ দুটো ভাই খোল্ না!

মেলায় থাকে নাগরদোলা সার্কাস স্থানীয়ভাবে তৈরি মিষ্টান্ন-আমৃতি, জিলাপি, চমচম, রসগোল্লা, রাজভোগ, কালোজাম, দই, ঘি ও সন্দেশের দোকান। খেলনা আর মন্ডা মিঠাই,বাউল গান আর গরুর লড়াই মেলার এসব স্মৃতিতে ছড়া রয়েছে জালাল উদ্দীন ইমন এর 'খেলনা ভরা মাঠ' ছড়ায়।

'বোশেখ এলেই মনে পড়ে
বাউল গানের সুর
মন ছুটে যায় অনেক দূরে
হারায় অচিনপুর।
মেলার মাঠে মিঠাই উঠে
খেলনা ভরা মাঠ
চলে আবার গরুর লড়াই
গঙ্গাপুরীর ঘাট।

নববর্ষের মেলা মনে রং আনে। তবলা-ঢোলক, বাঁশি-কাঁসির বাজনায় মেলায় এলে সবাই থাকে হাসিখুশি।

আহমেদ কবির-এর কাটবে সুখে বেলা ছড়ায় উঠে

এসেছে বাংলার মেলার চিরাচরিত চেহারা। গল্পের চিত্রকল্প ফুটে উঠেছে। নাগরদোলায় চড়া, মাটির গরু-মহিষ,হাড়ি-পাতিল কেনার কথা। আবার সন্ধ্যায় ঘরে ফেরার পালা।

হাওয়ার মতো উড়বো আজি
চড়ে নাগরদোলা,
কিনবো মাটির গরু-মহিষ
হাড়ি-পাতিল, চুলা।
বিন্নি ধানের খই নেব রে
মণ্ডা, সন্দেশ, মিঠাই,
মুখটি রসে ভরপুর হবে
হরেক স্বাদের পিঠাই।
পাতার বাঁশি মুখে হাসি
ফিরবো সাঁঝের বেলায়,
আয়রে তোরা কে কে যাবি
বোশেখের ঐ মেলায়?

মেলা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে অনবদ্য কবিতা লিখেছেন কবি আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫)।

ফুলের মেলা পাখির মেলা
আকাশ জুড়ে তারার মেলা,
রোজ সকালে রঙের মেলা
সাত সাগরে ঢেউয়ের মেলা।
আর এক মেলা জগৎ জুড়ে
ভাইরা মিলে, বোনরা মিলে,
রঙ কুড়িয়ে বেড়ায় তারা...
আপনি গড়া এই যে মেলা,
এই মেলাতে নিত্য চলে
আপন মনে একটি খেলা।
সারা বেলাই সেই এক খেলা
গড়বে নতুন একটি বাগান,
অনেক ফুল আর অনেক পাখি
সব পাখিদের আলাদা গান–
তার মাঝেই একটি সুরে
সবারই সুর যায় মিলিয়ে
এক দুনিয়া এক মানুষের
স্বপ্ন তারা যায় বিলিয়ে।

আহসান হাবীব 'মেলা' কবিতায় বিশ্বজুড়ে ভালোবাসার, একতার, মিলনমেলার আহ্বান জানিয়েছেন।

আমরা চারদিকে তাকালে দেখতে পাই বাগানে ফুলের মেলা, গাছে গাছে পাখির মেলা রাতের আকাশে তারার মেলা, নদীতে ঢেউয়ের খেলা চিরন্তন। এ হলো প্রকৃতির জগৎ। অন্যদিকে পৃথিবীর শিশু-কিশোরদের রয়েছে একটা আলাদা জগৎ, আরেকটা মেলা।

নবারুণের বন্ধুরা, মেলায় গিয়ে তোমরা লুডু,গুলতি, লাটিম, মার্বেল কিনতে পারবে। ঘুড়ি উড়ানো, এক্কাদোক্কা, দাঁড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট, হাডুডু খেলাসহ নানা আয়োজনে মেতে উঠতে পারবে। খেলার ছলে বাংলার ঐতিহ্যের সন্ধান পাবে। শিকড় খুঁজে পাবে। তোমাদের বয়সি নতুন প্রজন্ম পিজ্জা, স্যান্ডুইচ, বার্গারে অভ্যস্থ হয়ে উঠেছ। মেলায় এলে দেশীয় পিঠা-পুলির স্বাদ চিনতে পারবে। ঐতিহ্যবাহী পাটিসাপটা, তালবড়া, বিবিখানা, মুন্ডা, মোরা, ঝিনুক, দুধ চিতই, জামাই পিঠা, বউ পিঠা, ভাপা পিঠা, সিদ্ধ পুলি, পাকন, খেজুর পিঠা, মালপোয়াসহ নানা স্বাদের পিঠা তোমাদের মন ভরাবে। এসবের সাথে মেলা নিয়ে গান কবিতারও খোঁজ পাবে। মেলাতে বইও পাওয়া যায়। এছাড়া বই নিয়েও তো মেলা হয়। আর তাহলেই তোমরা বেড়ে উঠতে পারবে বাংলার আবহে, বাঙালি পরিচয়ে। ■

তথ্যসূত্র:

১. ড. সাইমন জাকারিয়া 'বাংলাদেশের মেলা'
২. প্রথম আলো, ১০ই জানুয়ারি ২০২০
৩. হারুন উর রশীদ স্বপন ঢাকা, মেলা আজও আছে, তবে প্রাণ নেই, ডয়েছেভেলে, ১৬ই অক্টোবর ২০১৭
৪. দৈনিক সমকাল, ঢাকা, ১০ই এপ্রিল ২০১৮
৫. সহকারী শিক্ষক, ন্যাশনাল ব্যাংক পাবলিক কলেজ, ঢাকা
৬. অনলাইনের বিভিন্ন সূত্র

অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বিএল কলেজ, খুলনা

মেলা নিয়ে গালগল্প

মুন্সী নজরুল ইসলাম

বাংলাদেশে ঋতুভিত্তিক মেলা,কৃষি উৎসব বা ধর্মীয় পার্বন উপলক্ষ্যে লোকজ মেলাগুলো চলে আসছে হাজার বছরেরও আগে থেকে।

প্রতি বছর মেলা বসে প্রায় পাঁচ হাজারেরও বেশি। এত এত মেলা নিয়ে গল্পেরও যেন শেষ নেই।

পুরনো দিনের ঘটনাগুলো তোমাদের কাছে মনে হবে গালগল্পের মতো। তবে এগুলো গল্প নয়, সত্য ঘটনা। তবে জেনে নাও সেইসব গল্প কথা।

■ মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন (১৮৮৮-১৯৯৪) ছিলেন সওগাত পত্রিকার সম্পাদক প্রকাশক। কাজী নজরুল ইসলাম, সুফিয়া কামালসহ অনেকেই তাঁর পত্রিকায় লিখে যশস্বী হয়েছিলেন। সেই সময় ৮/১০ বছরের মেয়েদেরই বিয়ে দিয়ে শ্বশুরবাড়ি পাঠানো হতো। মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, বিয়ে করে আনা তাঁর বালিকা বধূটি সারাক্ষণ মনমরা হয়ে থাকে। চুপচাপ সময় কাটে। মা আমাকে বলল, মেলায়

যাও। মেলা থেকে কয়েকটা পুতুল বৌ কিনে এনে বৌকে দাও। মায়ের কথামতো মেলা থেকে পুতুল বৌ কিনে এনে দিতেই বালিকা বধূ ভীষণ খুশি। সেগুলো নিয়ে খেলায় মেতে উঠল।

■ আমাদের ছেলেবেলায় অপেক্ষায় থাকতাম বছর ঘুরে কবে মেলা আসবে। নাগরদোলা, পুতুল নাচ, সার্কাস এইসব দেখব। খেলনা বাঁশি, আম কাটা ছুরি, মন্ডা মিঠাই কিনব। সেবার বাড়ির কাছেই চৈত্রসংক্রান্তির মেলা বসেছে। মেলায় যাবার জন্য বায়না ধরলাম। ছোটোমানুষ মেলায় গিয়ে হারিয়ে যাই কিনা,মায়ের সে আশঙ্কা ছিল। তবুও দু ভাইকে মেলায় যাবার অনুমতি দিল মা। তবে মেলায় যাবার পয়সা নেই। খুব মনমরা হয়ে আছি দুভাই। ভর দুপুরে মা লেগে গেল খই ভাঁজতে। বেতের ধামা ভরে খই মাথায় করে দু'ভাই চলে গেলাম মেলায়। দেখতে দেখতে বেতের সের মাপে সব খই বিক্রি হয়ে গেল। বেশ কতকগুলো টাকা হলো। জিলাপি, সন্দেশ, খেলনা বাঁশি কিনে মন তখন ফুরফুরে। সে আনন্দের যেন সীমা নেই।

সমাজে সব মানুষের বিশ্বাস আর ভাবনা এক রকম নয়। গ্রাম্য কোনো কোনো মানুষের রয়েছে অন্যের কাজ নিয়ে টিপ্পনি কাটার অভ্যাস। পরিশ্রমের কাজ, নিজের হাতে আয় রোজগারের কাজকেও তারা বাঁকা চোখে দেখে। আমাদের দুভাইয়ের খই বেচা দেখে এমনি এক প্রতিবেশীর মান মর্যাদার হানি ঘটেছে। আঁতে ঘা লেগেছে। বলল, তোমরা খই নিয়ে মেলায় আসবে জানলে আমি মেলায় আসতাম না। বন্ধুরা, আসলে নিজেদের জিনিস বিক্রি করাতে মান যায় না।

■ এবার শোনো এক টুকরো হাসির গল্প। ছোট্ট বেলায় মেলার ঢাক নিয়ে বাবার মুখে এ গল্প শুনে হাসিতে ফেটে পড়তাম।

মেলা উপলক্ষ্যে নাতি আব্দার করছে,
দাদু, মেলা থেকে ঢাক কিনে দাও না।
দাদু: না, তাহলে তুই আমাকে ঘুমাতে দিবি না।
নাতি: না দাদু, তুমি যখন ঘুমিয়ে থাকবে, তখন বাজাবো!

মেলা মানে অনেক লোকের ভিড়। চেনা-অচেনা মানুষের কোলাহল। মেলার ভিড়ে দুষ্টু লোকেদের আনাগোনাও বাড়ে। তারাও সুযোগ বুঝে পকেট সাফ করে নেয়। এবার শোনো মেলায় পকেট কাটা অসৎ লোকের গল্প। মেলায় গিয়ে এক লোক বন্ধুদের শুনিয়ে বলছে, মেলায় নাকি পকেটমার আসে। এত এত টাকা নিয়ে আজকে মেলায় এলাম। আমার পকেট তো কেউ কাটলো না। তখন ধৈর্য্য ধরে থাকতে না পেরে পাশে থাকা পকেটমার বলছে, আপনার কোমরে প্যাঁচানো রয়েছে ফুটো পয়সা, তিনবার দেখেছি। সেই সময়ে এক পয়সা মূল্যমানের, মাঝখানে ছিদ্র করা পয়সারও প্রচলন ছিল। আসলে ও লোকটা এক পয়সা কোমরে গুঁজে মেলায় গিয়েছিল। ■

প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক, বিএল কলেজ, খুলনা

লোক ও কারুশিল্প মেলা

জাহিদ হাসান

বাংলার লোকশিল্প ও লোকজ ঐতিহ্য বিকাশের এক সমৃদ্ধ জনপদ সোনারগাঁ। গ্রামবাংলার হারিয়ে যাওয়া কৃষ্টি আর ঐতিহ্যকে ধারণ করতে, লোকজ সংস্কৃতিকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে প্রাচীন বাংলার রাজধানী খ্যাত সোনারগাঁয়ে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয় মাসব্যাপী লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসবের।

স্বাধীন বাংলার প্রখ্যাত সুলতান ফখরউদ্দিন মুবারক শাহ, সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ ও বাংলার বার ভূঁইয়ার অন্যতম বিখ্যাত ঈশা খাঁর রাজধানী সোনারগাঁয়ের ইতিহাস ছিল অনেক বেশি জ্বলজ্বলে। সময়ের পরিক্রমায় তা ম্লান হয়ে যায়। সোনারগাঁও পুনজাগরিত করতে ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন। এ ফাউন্ডেশনের অধীনে লোকশিল্প জাদুঘরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ফাউন্ডেশন চত্বরে 'সোনারতরী' লোকজমঞ্চে মেলা উদ্‌বোধন করা হয়। লোকজমঞ্চে প্রতিদিন জারি, সারি, বাউলগান, কবিগান, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, মাইজভান্ডারি, লালন সংগীত, হাসনরাজা, মুর্শিদী, পালাগান, গায়ে হলুদের গান পরিবেশিত হয়। এছাড়া বান্দরবান, বিরিশিরি, কমলগঞ্জের মণিপুরি, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পুঁথি পাঠ, ছড়া পাঠের আসর, লোকজ জীবন প্রদর্শনী, লোকজ গল্প বলা, ঘুড়ি ওড়ানো, পিঠা প্রদর্শনী, বায়োস্কোপ ও পুতুল নাচ দেখারও ব্যবস্থা থাকে।

দেশের বিভিন্ন স্থানের ঐতিহ্যবাহী পণ্যের সমারোহ দেখতে পাওয়া যায় এ মেলায়। মাগুরা ও নওগাঁর শোলাশিল্প, চট্টগ্রামের তালপাখা ও নকশিপাখা, রাজশাহীর শখের হাঁড়ি, সিলেট ও মুন্সিগঞ্জের শীতলপাটি, কুমিল্লার তামা-কাঁসা-পিতলের ও কাঠের কারুশিল্প, রংপুরের শতরঞ্জি 'বাঁশ ও বেতের কারুশিল্প, নকশি কাঁথা, কিশোরগঞ্জের টেরাকোটা শিল্পসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী কারুপণ্য প্রদর্শনীর ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা থাকে। প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত ফাউন্ডেশনের চত্বর খোলা থাকে মেলায় আগত দর্শনার্থীদের জন্য। ছুটির দিনে অথবা অবসরে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে মেলায় ঘুরে আসা যায় আর দেখতে পারা যায় প্রাচীন বাংলার এক সমৃদ্ধ জনপদের বর্তমান রূপ। ■

প্রাবন্ধিক

আকাশে ঘুড়ির মেলা

রওশন রুমি

আকাশে ঘুড়ির মেলা নামটি শুনেই তোমরা অবাক হবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, কারণ সব মেলাই তো হয় জমিনে বা স্থলে, কিন্তু ঘুড়ি মেলা হয় আকাশে। পৌষের শেষ দিনে সাকরাইন উৎসবে হয় এ মেলা। এ দিন কমবেশি সারা দেশের আকাশেই ঘুড়ির মেলা দেখা যায়। তবে ঘুড়ি উৎসব পুরান ঢাকার বাসিন্দারাই উৎসবের আমেজে ঘটা করে পালন করে ।

হাতে নাটাই, আকাশে রং-বেরঙের ঘুড়ি এমন দৃশ্য সাকরাইন বা ঘুড়ি উৎসবে রাজধানীর পুরান ঢাকার প্রতিটি বাড়ির ছাদে ও মাঠে দেখা যায়। নারিন্দা, লক্ষ্মীবাজার, ফরিদাবাদ, ফরাশগঞ্জ, সূত্রাপুর, শাঁখারীবাজার, ডালপট্টিসহ পুরান ঢাকার বিভিন্ন স্থানে উৎসবের আবহ ছড়িয়ে থাকলেও মূল কেন্দ্রবিন্দু ঐতিহ্যবাহী ফরাশগঞ্জের লাল কুঠির ছাদ।

প্রতি বছরই এ বাড়িতে ঢাকা কেন্দ্র ও পুরান ঢাকা ঘুড়ি সংঘ যৌথভাবে করে থাকে পৌষ-সংক্রান্তি (সাকরাইন) উৎসব। চক্ষুদান, মালাদান, চারবুয়া, মাছলেঞ্জাসহ বিভিন্ন নামের ঘুড়িগুলো উড়ানোর সময় উৎসুক মানুষেরা খুঁজে নেয় একটি বর্ণময় বিকেল। দর্শকদের মাঝে ফুটে ওঠে আনন্দ আর উচ্ছ্বাস। অসাধারণ এক উৎসব

উপহার দেওয়ার অভিপ্রায়ে সন্ধ্যায় ঢাকাবাসী মেতে ওঠে একটু ভিন্ন আমেজে এবং ভিন্ন মেজাজে। আতশবাজি ফুটিয়ে, ঢাকঢোল বাজিয়ে, আকাশে অবিরাম ফানুস উড়িয়ে সন্ধ্যার আকাশে চলে আপন সৌন্দর্যে রাঙানো রুচি-অভিরুচির খেলা। দেখে মনে হয় যেন আকাশে বসেছে ঘুড়ির মেলা। এ সময় পুরান ঢাকার প্রত্যেকটা বাড়ির ছাদ সাজানো হয় নানান লেজার লাইটের আলোতে। ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন উৎসব সাকরাইনকে ঘিরে ১৪ই জানুয়ারি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এমন দৃশ্য দেখা যায়।

শীতের দুপুরে নিভু নিভু সূর্য যখন পশ্চিম আকাশে হেলে পড়ে তখন পুরান ঢাকার আকাশে শোভা পায় নানান রঙের ঘুড়ি। ঘুড়িতে ঘুড়িতে কাটাকাটি খেলার আনন্দে মেতে উঠে শিশু-কিশোর থেকে বিভিন্ন বয়সিরা। খেলায় হেরে যাওয়া অভিমানী ঘুড়ি সুতার বাঁধন ছিঁড়ে উড়ে চলে যায় দূর অজানায়। তা দেখে ব্যথিত হয় ঘুড়িওয়ালা, কিন্তু ব্যথা ছাপিয়ে উল্লাসের ধ্বনি বেজে উঠে চারপাশে।

এছাড়া সাকরাইনকে কেন্দ্র করে পুরান ঢাকার আশপাশের অলিগলিতে বিভিন্ন ঘুড়ির দোকান এবং মেলাও বসে। এ উপলক্ষ্যে পুরান ঢাকার প্রতিটি বাড়িতে আয়োজন করা হয় নানা ধরনের মুখরোচক রান্নাবান্না। উৎসবের সঙ্গে রসনাবিলাস ভিন্ন এক আবহ তৈরি করে পুরান ঢাকার বাসিন্দাদের মাঝে। উৎসবের সব পর্ব শেষ করে একে অন্যের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে ইতি ঘটে এ উৎসবের। জানা যায়, এ ঘুড়ি উৎসবের যাত্রা শুরু হয় ১৭৪০ সালে মোগল আমলে। নায়েব-ই-নাজিম নওয়াজেশ মোহাম্মদ খানের আমলে ঘুড়ি ওড়ানোর দিনকে কেন্দ্র করে বর্তমানে সাকরাইন উৎসবের আমেজে পরিণত হয়েছে। দিনব্যাপী নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে এ উৎসব উদ্‌যাপন করেন পুরান ঢাকার সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ।■

গল্পকার ও প্রাবন্ধিক

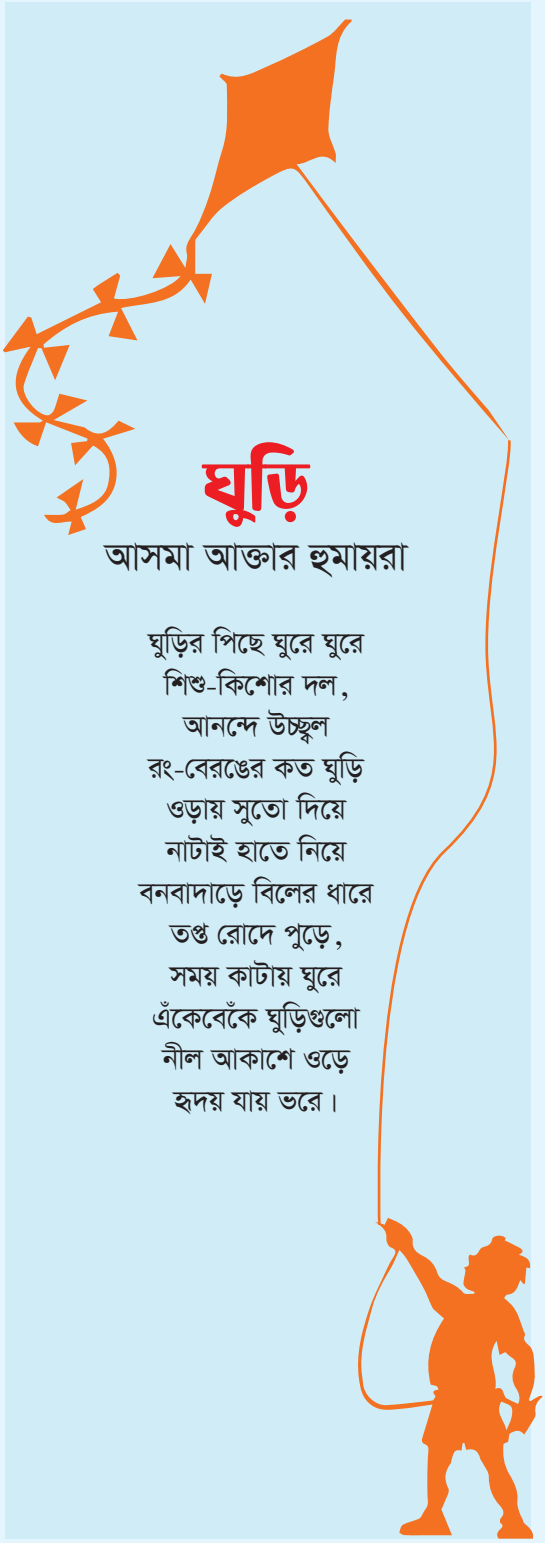

ঘুড়ি

আসমা আক্তার হুমায়রা

ঘুড়ির পিছে ঘুরে ঘুরে
শিশু-কিশোর দল,
আনন্দে উচ্ছল
রং-বেরঙের কত ঘুড়ি
ওড়ায় সুতো দিয়ে
নাটাই হাতে নিয়ে
বনবাদাড়ে বিলের ধারে
তপ্ত রোদে পুড়ে,
সময় কাটায় ঘুরে
এঁকেবেঁকে ঘুড়িগুলো
নীল আকাশে ওড়ে
হৃদয় যায় ভরে।

পুষ্প মেলা

ফুল কে না পছন্দ করে। আর যদি ফুলের মেলা বসে তবে সে রাজ্যে হারিয়ে যেতে কার না মন চায়। সারা বছরই ফুলের মেলা বসে তবে শীতকালেই বেশি ফুলের মেলা বা প্রদর্শনী হয়। শুধু ঢাকার খামারবাড়ি নয় বিভাগীয় শহরগুলোতেও আয়োজন হয় ফুল মেলা আর উৎসবের। নানা জাতের বাহারি ফুল গাছের সংগ্রহ থাকে মেলায়। জানা-অজানা নানা ধরনের ফুলগাছ সংগ্রহ করতে সবাই ভিড় করে ফুল মেলায়। এতে বিভিন্ন রঙের গোলাপ, জবা, অর্কিড, গাঁদা, দেশি-বিদেশি নানা জাতের ফুল গাছের সমারোহ থাকে।

বৃক্ষ মেলা

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলেক্ষ্যে ঢাকার আগারগাঁওয়ে প্রতি বছর মাসব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় বৃক্ষমেলা। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের পাশে বিশাল মাঠে তৈরি হয় ঘন সবুজের সমারোহ। মেলায় স্থান পায় নানা প্রজাতির গাছ, থোকায় থোকায় ধরে থাকা চেনা-অচেনা ফল, প্রস্ফুটিত ফুলের সৌন্দর্যে চোখ জুড়িয়ে যায়। বনজ, ফলজ, ঔষধি গাছ কিংবা ঘর সাজানোর অর্কিড, বনসাই-কী থাকে না এই মেলায়!

নানা বয়সি, শ্রেণি-পেশার মানুষের পদচারণায় জমে উঠে এই মেলা। স্টলগুলো অর্কিড, বনসাই, বীজ, সার, ছোটো কৃষিযন্ত্রপাতি দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়। স্টলের সামনে থরে থরে সাজানো থাকে নানা প্রজাতির দেশি-বিদেশি গাছ। ফলের চারাগুলোতে ধরে থাকে মৌসুমি ফল। বিশেষ করে ছোট্ট ছোট্ট গাছে ঝুলে থাকা রসালো আমে সবার চোখ জুড়িয়ে যায়। এছাড়াও পাকা কাঁঠাল, জাম্বুরা, কমলা, বেদনা, মাল্টার ঘ্রাণ। গন্ধে বৃক্ষমেলায় বাতাস মৌ মৌ করে। ■

-মো. জোবায়ের হোসেন

পাখি মেলা

শীতে পরিযায়ী পাখির সমারোহ দেখা যায় জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাই প্রতি বছর এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগ আয়োজন করে পাখি মেলার।

প্রকৃতির অলংকার পাখি শিকার বন্ধে গণসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যেই পাখি মেলা বসে। সাথে থাকে বাংলাদেশের নতুন ও বিরল প্রজাতির পাখি চিহ্নিতকরণ, পাখি চেনা, পাখির আলোকচিত্র প্রদর্শনী, পাখির ছবি আঁকা প্রতিযোগিতা, টেলিস্কোপ ও বাইনোকুলার দিয়ে পাখি পর্যবেক্ষণসহ নানা প্রতিযোগিতা।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পাখি বসবাসের উপযোগী পরিবেশ আছে। এ ধরনের পরিবেশ সারা দেশে নিশ্চিত করার স্বার্থেই পাখির মেলার আয়োজন করা হয়। এছাড়াও পাখি খাঁচায় পোষার প্রতি যাদের আগ্রহ আছে তাদের জন্য বাংলাদেশের অনেক জায়গায় পাখি মেলার আয়োজন করা হয়। খাঁচার পাখি কেনাবেচাসহ পাখির যত্ন, খাবারসহ নানা রকম বিষয় থাকে এ মেলায়।

প্রজাপতি মেলা

'উড়লে আকাশে প্রজাপতি, প্রকৃতি পায় নতুন গতি' এ ধরনের প্রতিপাদ্য নিয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয় প্রজাপতি মেলা। প্রজাপতি সংরক্ষণ ও গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের কীটতত্ত্ব শাখা এ মেলার আয়োজন করে। বাহারি রঙের প্রজাপতি দেখতে ক্যাম্পাসে ভিড় করেন প্রজাপতিপ্রেমীরা।

মেলায় প্রজাপতির গল্পে পাপেট শো প্রদর্শিত হয়। এছাড়া প্রজাপতির লার্ভা ও প্রজাপতিনির্ভর গাছপালার তথ্যচিত্র নিয়ে একটি পাম্পলেট প্রকাশিত হয়। দিনব্যাপী অন্যান্য আয়োজনের মধ্যে থাকে প্রজাপতিবিষয়ক আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী, জীবন্ত প্রজাপতি প্রদর্শন, প্রজাপতির আদলে ঘুড়ি ওড়ানো প্রতিযোগিতা, বারোয়ারি বিতর্ক প্রতিযোগিতা, প্রজাপতি চেনা প্রতিযোগিতা, প্রজাপতিবিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী ইত্যাদি।

প্রজাপতি সংরক্ষণ ও গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১০ সাল থেকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রজাপতি মেলা আয়োজিত হচ্ছে। ■

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

ভিনদেশের নববর্ষ

রঘু অভিজিৎ রায়

ঢাকায় পহেলা বৈশাখ মানেই রমনার বটমূলে নতুন বছরকে বরণে ছায়ানটের বিপুল উদযাপন। সূর্য ওঠার আগেই নানা রঙের পোশাকে নানা বয়সের মানুষের রমনার দিকে ছুটে চলা। ইলিশ-পান্তা খাওয়ার আয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার শিক্ষার্থীদের বর্ণিল শোভাযাত্রা। শহরের নানা প্রান্ত, অন্য শহর, এমনকি বিদেশ থেকে দেশি-বিদেশি অনেকের এ উপলক্ষ্যে ঢাকায় চলে আসা। সারা শহরজুড়ে উৎসব আর আয়োজনের সমাহার। ফুল-বেলুন আর বাঁশির আওয়াজে মুখর এক শহর সেদিন ঢাকা। সরকারি ছুটি থাকে এ দিন।

ঢাকার আজকালের এ ছবি আমাদের সকলেরই চেনা। এ হলো নাগরিক আয়োজন। শুরু হয়েছে বাংলা ১৩৭১, খ্রিষ্টীয় ১৯৬৪ সাল থেকে। তবে এখন এ আয়োজনটি আর শুধু ঢাকা নয়, সারা দেশের সব শহরে পালিত হয়। গ্রামগঞ্জেও এর রেশ চালু হয়েছে।

দেশে দেশে নানা আয়োজনে নববর্ষ পালন করা হয়। কারো নববর্ষ আসে সৌর পঞ্জিকার হিসেবে। কারো কারো হিসাব হয় চাঁদের মাসের সাথে মিলিয়ে। আবার কারো চান্দ্র তিথি মেনে হলেও সৌর বছরের সাথে সামঞ্জস্য করে।

চীন: উত্তর-পূর্ব চীনে নববর্ষের দিনটি বসন্ত উৎসব নামেও পরিচিত। বুঝাই যায় এ দিনটি বসন্তকালেই হতে হবে। তারা চান্দ্র তিথির সাথে মিলিয়ে বসন্তকালে তা উদযাপন করে। তিথিটি আসে

২১শে জানুয়ারি থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে কোনো একদিন। চীন, কোরিয়া, লাওস, ভিয়েতনাম মোটামুটি একইভাবে নববর্ষ পালন করে থাকে।

ভিয়েতনাম: ভিয়েতনামে চীনের অনুরূপ ক্যালেন্ডার ব্যবহার করে নববর্ষ বা বসন্ত উৎসব পালন করে থাকে।

কোরিয়া: কোরিয়ায় ১লা জানুয়ারি নববর্ষ পালিত হলেও তাদের চান্দ্র নববর্ষের ঐতিহ্যটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। চান্দ্র নববর্ষকে তারা বলে সিওল্লাল। তারা বিশ্বাস করে, সিওল্লাল উদ্‌যাপন তাদের সারা বছরের জন্য সৌভাগ্য বয়ে নিয়ে আসে। দিনটি ঠিকমতো পালন করলে খারাপ আত্মা কাছে এসে ক্ষতি করতে পারে না।

জাপান: জাপানে নববর্ষ শোগাতসু পালিত হয় ১লা জানুয়ারি। তবে উৎসবটি এক সময় চান্দ্র বছরের প্রথম দিনে ৩৫৪ দিনের চান্দ্র বছরের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী পালন করা হতো ।

ইরান: ইরানে নববর্ষকে বলা হয় নওরোজ। ইরানকে এক সময় পারস্য বলা হতো। পারস্যে প্রাচীনকালে জরাথুস্ট্র ধর্ম পালন করা হতো। জরাথুস্ট্র ধর্ম অনুসারী পারসিকগণ ২০, ২১ বা ২২শে মার্চ নওরোজ বা নববর্ষ পালন করে থাকে। বর্তমানে ইরানের সামান্য কিছু সে ধর্মের লোক থাকলেও ইরানের নওরোজ তাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের সাথে মিল রেখে একই দিনেই পালন করা হয়। পারস্যের সংস্কৃতির প্রভাব সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের কাজাখিস্তান, উজবেকিস্তান ও চীনের উইঘরসহ মধ্য এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। এসব অঞ্চলেও ২২শে মার্চ নওরোজ নামে উৎসবটি পালন করে থাকে।

বালিদ্বীপ: বালিদ্বীপ ও জাভায় চলে সাকা ক্যালেন্ডার। বালিদ্বীপে সাকা ক্যালেন্ডারের চান্দ্র নববর্ষ নাইপি পালন করা হয়। তা হয়ে থাকে মার্চ মাসের দিকে। দিনটি তারা পালন করে নীরবতা, ধ্যান ও উপবাস করে। যদিও এটি হিন্দু ছুটির দিন। হিন্দুদের সম্মানে সবাই নীরবতার সাথে দিনটি পালন করে থাকে। পর্যটকদেরও হোটেল থেকে বের হতে দেওয়া হয় না। তবে রোগিদের জন্য বিশেষ ছাড় থাকে। বালিদ্বীপের একমাত্র বিমানবন্দরটিও বন্ধ থাকে।

কেমন করে আসে নববর্ষ, কীভাবে তার গণনা?

নববর্ষের হিসাব তো বছরের হিসাবের সাথে যুক্ত। আর এ হিসাবে দিন-মাস-বছর গণনা করে তৈরি হয় ক্যালেন্ডার বা পঞ্জিকা। ক্যালেন্ডার দেখে আমরা বলি কবে কখন আসবে পহেলা বৈশাখ। এক পহেলা বৈশাখ থেকে পরের পহেলা বৈশাখ আসতে লাগে তিনশ পয়ষট্টি দিন। সূর্যের চারদিকে পৃথিবী একবার ঘুরে আসতে এ সময়টুকু লাগে বলেই। আকাশে সূর্য ও পৃথিবীর কোনো অঞ্চল যে দূরত্বে ও কৌণিক অবস্থানে থাকে সে অনুযায়ী শীত বা গরম লাগে। তাই দেখা যায়, বৈশাখ মাসে গরম পড়ে, আবার মাঘ মাসে শীত পড়ে। অর্থাৎ প্রতি বছর গরমের দিনে পৃথিবীর কোনো অঞ্চল ও সূর্য পরস্পর একই অবস্থানে থাকে তাই একই রকম গরম অনুভব করি। অর্থাৎ সূর্য ও অঞ্চলটি কাছাকাছি থেকে সরাসরি আলো দেয় তাই গরম লাগে। একই ভাবে সূর্যটি ঐ অঞ্চলের সাথে হেলে একটু দূরে থাকে বলেই শীতও অনুভব করি। তার সাথে খাপ খাইয়ে তৈরি ক্যালেন্ডারটি হলো সৌর ক্যালেন্ডার। আমাদের ১লা বৈশাখ ও ইংরেজি নববর্ষ ১লা জানুয়ারির হিসাব হয় সৌর ক্যালেন্ডার দিয়ে।

আর এক ধরনের ক্যালেন্ডার আছে যা চন্দ্রের সাথে পৃথিবীর অবস্থানের ভিত্তিতে তৈরি। চান্দ্র বছর হয় ৩৫৪ দিনে। সৌর বছর থেকে চান্দ্র বছর মোটামুটি এগারো দিন কম। সৌর বছরের সাপেক্ষে চান্দ্র বছরের প্রথম দিনও তাই প্রতি বছর এগারো দিন এগিয়ে আসে। তাই চান্দ্র নববর্ষ সৌর নববর্ষের মতো শুধুই গরমের দিনে থাকে না। ১১ দিন করে এগিয়ে ক্রমে ক্রমে শীতকাল, শীতকাল থেকে গরমের দিনে এগুতে থাকে। এ অসুবিধা দূর করতে পৃথিবীর বহু জাতি তাদের নববর্ষটি পালন করে চান্দ্র ও সৌর ক্যালেন্ডারের এক জটিল হিসেবে। চীনা, তামিল ও ইহুদি নববর্ষগুলি এরূপ হয়ে থাকে। তবে প্রত্যেকে পালন করে তাদের নিজ নিজ রীতি-ঐতিহ্য মেনে।

ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ায় প্রধানত ১লা জানুয়ারিকে নববর্ষ হিসেবে পালন করে থাকে। তবে এসব দেশসহ পৃথিবীর নানা জাতি, আদিবাসী ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির মানুষ তাদের ঐতিহ্য, বিশ্বাস ও ধর্মীয় রীতিনীতি অনুসারে নববর্ষ পালন করে থাকে। বিচিত্র সংস্কৃতির এ সহ-অবস্থান ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা নিয়েই পৃথিবীর সকল মানুষ সকল মানুষকে ভালোবাসবে। আমরা সারা পৃথিবীর মানুষের বসবাসযোগ্য মানবিক পৃথিবীর দিকে এগিয়ে যাব, এই হোক নববর্ষের শিক্ষা। ■

সিনিয়র সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিককর্মী

শত বছরের মেলা

শাহানা আফরোজ

বারো মাসে তেরো পার্বণের দেশ বাংলাদেশ। সারা বছরই লেগে থাকে নানা উৎসব। গ্রামে-গঞ্জে শীতকাল আসলেই পৌষ-পার্বণের মেলা, হরেক রকমের পিঠা উৎসব, যাত্রাপালা ও লোক সাংস্কৃতিক, বসন্তের মেলাগুলো জমে উঠত। সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো মেলাকে কেন্দ্র করে জারি-সারি, ভাটিয়ালী, বাউল গানের আসর বসতো।

তাছাড়া বাংলার গ্রামগুলো ছিল বিচ্ছিন্ন, মূলত প্রয়োজন মেটানোর জন্য মেলার আয়োজন শুরু হয়। এর বাইরেও ঋতুভিত্তিক প্রয়োজনীয় পণ্য সংগ্রহের জন্য মেলা বসতে শুরু করে। মেলাগুলো সাধারণত: স্কুল কলেজের মাঠ, গ্রামের মন্দির, নদীর তীর বা বড়ো বৃক্ষের নিচে কেন্দ্র করে বসত। কালের বিবর্তনে কিছু মেলা হারিয়ে গেলেও কোনো কোনো মেলার আয়োজন আজ পেরিয়ে গেছে শত বছরের সীমারেখা। চলো এমন কিছু মেলা সম্পর্কে জেনে নেই–

বলীখেলার মেলা: জব্বারের বলীখেলা একটি জনপ্রিয় ও ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রতিযোগিতা হিসেবে বিবেচিত। যা চট্টগ্রামের লালদিঘী ময়দানে প্রতি বছরের ১২ই বৈশাখে অনুষ্ঠিত হয়। বলীখেলাকে কেন্দ্র করে লালদিঘী ময়দানের আশেপাশে প্রায় তিন কিলোমিটার জুড়ে বৈশাখি মেলার আয়োজন হয়। চট্টগ্রামের বদরপতি এলাকার ব্যবসায়ী আবদুল জব্বার সওদাগর ১৯০৯ সালের ১২ই বৈশাখ নিজ নামে লালদীঘির মাঠে এই বলীখেলার সূচনা করেন। খেলা আর মেলা মিলে অন্য রকম এক মাত্রা পায় বলী খেলার মেলা।

বাউল মেলা: প্রায় ৭০০শত বছরের ঐতিহ্যবাহী বাউল মেলা। নরসিংদী শহরের কাউরিয়াপাড়া মেঘনা নদীর তীরে বাউল আখড়াধামে বসে। মেলা উপলক্ষে আখড়াধামে হাজির হয় পাশের দেশ ভারতসহ দেশ-বিদেশের শতাধিক বাউল সাধক।

পীর মেছের শাহ'র মেলা: বাগেরহাটের মোংলা উপজেলার চাঁদপাই ইউনিয়নের দক্ষিণ চাঁদপাইয়ে পীর মেছের শাহ'র মাজারে প্রতি বছর ফাল্গুন মাসের চাঁদের পঞ্চম দিনে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে মেলা । যেটি ১০০ বছরেরও অধিক সময় ধরে চলে আসছে। মেলার অন্যতম আকর্ষণ দুই ঠোঁটে কুলুপ (এক ধরনের লোহার তালা) ফুটিয়ে জিকির করা। জিকির করতে করতে একসময় সেগুলো খুলে যায়।

কানাইলাল কুঞ্জ মেলা: গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার তুমলিয়া ইউনিয়নের চুয়ারিয়াখোলা গ্রামে পৌষ মাসের শেষের দিকে বসে শ্রী কানাইলাল কুঞ্জ মেলা। এ বছর মেলাটি ১০১ বছরে পা দিলো।

তাড়াশের দই মেলা: সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে প্রতি বছর মাঘ মাসের পঞ্চমী তিথিতে সিরাজগঞ্জের তাড়াশে প্রায় তিনশত বছরের ঐতিহ্যবাহী দইয়ের মেলা হয়।

বান্নি মেলা: ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তিতাস নদীর তীরে অনুষ্ঠিত হয় শত বছরের ঐতিহ্যবাহী 'বান্নি মেলা'। জনশ্রুতি রয়েছে, বৈশাখ মাসে নবাবদের কাছে প্রজারা খাজনা দিতে আসত। সে সময় খাবার-দাবারসহ বিভিন্ন পসরা সাজিয়ে বসতো বিক্রেতারা। সেটাই কালক্রমে মেলায় রূপ নিয়েছে।

কুড়িগাই মেলা: মেলার নাম কুড়িগাই। এ মেলার পেছনে রয়েছে শত বছরের ইতিহাস। কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী উপজেলা সদর থেকে ৩ কিমি ভিতরে পল্লি গ্রাম কুড়িগাইয়ে মেলাটি হয়। এ মেলার মূল আকর্ষণ জামাই-বউ মাছের মেলা।

সূর্যব্রত মেলা: চট্টগ্রামের বোয়ালখালী উপজেলার জ্যৈষ্ঠপুরা গ্রামে বসে শত বছরের ঐতিহ্যবাহী সূর্যব্রত মেলা। প্রাচীনকাল থেকে আপন ঐতিহ্যে মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের শেষ রোববার এ মেলা বসে। স্থানীয়দের মতে, ২/৩ শ বছর পূর্বে এ মেলার প্রচলন ঘটে।

বউ মেলা: নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার জয়রামপুর গ্রামে শত বছরের একটি বটবৃক্ষকে কেন্দ্র করে বউ মেলা বসে। বটগাছটি সিদ্ধেশ্বরী কালীতলা নামে পরিচিত। কিন্তু এলাকায় এটাকে বলা হয় বউতলা।

গ্রামীণ পৌষ মেলা: নাটোরের নলডাঙ্গা উপজেলার ঝুপদুয়ার এলাকায় তিনদিনব্যাপী ২০০ বছরের ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ পৌষ মেলা জমে উঠে।

সূর্যমণি মেলা: বরিশাল জেলার বর্তমান বানারীপাড়া উপজেলার সলিয়াবাকপুর ইউনিয়নের বেতাল গ্রামের বর্তমান সূর্যমণির মাঠে বসে মেলা। ২২৭ বছর পূর্বে জমিতে পাওয়া সূর্যমূর্তিকে কেন্দ্র করে শুরু হয় সূর্যমণি-পূজা। আর দিনটি ছিল মাঘী সপ্তমীর শুক্লপক্ষ। ১৭৯৫ সালে এ পূজাকে ঘিরে প্রথম মেলার আয়োজন করা ১৯৭০ সালের দিকে। মেলা তিনদিন হলেও এখন মেলার ব্যাপ্তি বেড়ে ৩০ দিনে দাঁড়িয়েছে।

ডুবের মেলা: টাঙ্গাইলের বাসাইলে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব ঐতিহ্যবাহী ডুবের মেলা। স্থানীয়রা জানায়, ব্রিটিশ শাসনামলে বক্ত সাধু নামে খ্যাত এক সন্যাসী মাদব ঠাকুর-এর মূর্তি প্রতিস্থাপন করে মনোবাসনা পূর্ণ করতে গঙ্গাস্নান, পূজা-অর্চনা করে। ওই সময় থেকে এটা ডুবের মেলা নামে পরিচিত।■

গুণীজনের মেলা

রিয়াদুল ইসলাম

রবীন্দ্র মেলা: বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত কুষ্টিয়ার শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে ফুলতলার দক্ষিণডিহি ও রূপসার পিঠাভোগে ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্র মেলার আয়োজন করা হয়। বিশ্বকবির স্মৃতিকে ঘিরে প্রতি বছর জমে উঠে উৎসব, বসে বিরাট গ্রামীণ মেলা। নামে মানুষের ঢল। আগমন ঘটে দেশ-বিদেশের স্বনামধন্য কবি, সাহিত্যিক ও গুণীজনসহ কয়েক হাজার দর্শনার্থীর। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি চলে বাহারি পণ্যের কেনাবেচা।

নজরুল মেলা: কবি নজরুলের স্মৃতি বিজড়িত ত্রিশালের দরিরামপুর একাডেমি মাঠ নজরুল জন্মজয়ন্তী উৎসবকে ঘিরে পরিণত হয় মিলনমেলায়। নজরুলের জন্মজয়ন্তীতে প্রতি বছরই মেলার আয়োজন করা হয়। ১৯৬৫ সাল থেকে শুরু হওয়া এই মেলা স্থানীয়দের মধ্যে পারস্পরিক ভাব বিনিময়েরও মাধ্যম। কবি নজরুলের অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ত্রিশালের এই মেলা হয়ে উঠে নজরুল প্রেমের প্রতীক।

মধু মেলা: মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সাগড়দাঁড়িতে সপ্তাহব্যাপী সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের অধীনে মেলার আয়োজন করা হয়। এ মেলায় দেশ ও বিদেশ থেকে হাজারো মানুষের সমাগম ঘটে। দেশবরেণ্য কবি সাহিত্যিকদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে ওঠে সাগরদাঁড়ির মধুপল্লি।

লালন মেলা: ছেঁউড়িয়ায় লালনের তার প্রতিষ্ঠিত আখড়াবাড়িতে প্রতি বছর দোলপূর্ণিমায় 'সাধুসেবা' বা 'সাধুসঙ্গ' করতেন। পর্বের গান তথা দৈন্যগান, গোষ্ঠগান, প্রবর্ত্তসহ নানাবিধ তত্ত্বগান পরিবেশিত হতো। পাশাপাশি লালনপন্থী ব্যক্তিদের সাধন পদ্ধতির বিভিন্ন দিক নিয়ে অনুষ্ঠিত হতো আলোচনা সভা। লালন প্রবর্তিত সাধুসঙ্গের এই ধারা গুরু-শিষ্য পরম্পরা লালনপন্থী সাধক সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনো চলছে। ছেঁউড়িয়ার লালন সাঁইয়ের সমাধি প্রাঙ্গণ থেকে সাধুসঙ্গের সেই প্রাচীন ধারা পরিবর্তিত হয়ে লালন মেলায় রূপ লাভ করেছে।

জসীম মেলা: এটি পল্লিকবি জসীমউদ্দীন স্মরণোৎসব মেলা। ফরিদপুর শহরের কাছেই কবির জন্মভিটা অম্বিকাপুরে প্রতি বছর এ মেলা বসে থাকে। এ মেলার প্রধান আকর্ষণ থাকে পল্লিগীতি ও বিচারগানের আসর।

এছাড়াও এ মেলাতে থাকে ফরিদপুরের ঐতিহ্যবাহী শীতলপাটি, মাটির হাঁড়ি, মাটির পুতুল, লোহার সামগ্রী ও বাঁশ-বেতের গৃহসামগ্রী।■

প্রাবন্ধিক

পার্বত্য মেলা

ফারজানা হক

পাহাড়ি জীবন সম্পর্কে কিন্তু আমাদের জানার খুব আগ্রহ তাই না বন্ধুরা। আমরা পাহাড়ে না গিয়েও কিন্তু পাহাড়ি জনগণের জীবন-জীবিকা সম্পর্কে জানতে পারি, পেতে পারি তাদের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী ও কারুপণ্য। কিন্তু কীভাবে? পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে প্রতি বছর ঢাকায় পার্বত্য মেলা উদযাপিত হয়। এ পার্বত্য মেলার মাধ্যমে পাহাড়ের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, ইতিহাস ও ঐতিহ্য দেশের আপামর মানুষের মধ্যে তুলে ধরা হয়। এ পার্বত্য মেলা যেন রাজধানীতে এক টুকরো পাহাড়ি জনপদ। পার্বত্য এলাকার মানুষের জীবন ও কৃষি সংস্কৃতির সাথে সমতলের মানুষকে পরিচয় করিয়ে দেওয়াই এই মেলার উদ্দেশ্য। এ মেলায় সরকারি প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ, প্রতিষ্ঠিত উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের স্টল থাকে। তারা বিভিন্ন পণ্য নিয়ে হাজির হয়। মেলায় তিন পার্বত্য জেলায় উৎপাদিত কৃষিপণ্য সামগ্রী, হস্তশিল্প, ঐতিহ্যবাহী কোমর তাঁতে বোনা পণ্য, ঐতিহ্যবাহী পার্বত্য খাবার ও বিভিন্ন মৌসুমী ফল প্রদর্শন, প্রচার ও বিপণন করা হয়। এছাড়াও মেলায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও পরিবেশিত হয়। উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী প্রচার ও বিপণনের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে পার্বত্য মেলার আয়োজন করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। এ আয়োজনের মাধ্যমে পার্বত্য ও সমতলের মানুষের মধ্যে সুসম্পর্ক ও বন্ধুত্বের বন্ধন রচিত হয়। ২০১৫ সাল থেকে এ মেলার আয়োজন করা হচ্ছে।■

ব্যতিক্রমী মেলা

নাজমুল ইসলাম ফারুক

শস্য-শ্যামল ফসলে ভরা বাংলাদেশ। পুরো দেশ জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আবহমান বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতি। নানা উৎসবে, পার্বণে মেতে উঠে সবাই একসাথে, একপ্রাণে, মিলেমিশে। এমনি কিছু উৎসবের উপলক্ষ্য হলো মেলা। দেশের আনাচে-কানাচে কত রকম মেলা উদ্‌যাপন করে থাকি আমরা। যা অনেক আগে থেকেই প্রচলিত। এ মেলাগুলোর নামগুলোও বেশ মজার। এসো জেনে নেই-

পোড়াদহ মেলা

এটি বাংলাদেশের একটি প্রাচীন লোকজ মেলা। ধারণা করা হচ্ছে, প্রায় চারশত বছর পূর্বে এ মেলার শুরু। এর অবস্থান বগুড়া জেলার ইছামতি নদীর তীরে। পোড়াদহ জায়গার নাম অনুসারে মেলার নামকরণ। প্রতি বছর বাংলা সনের মাঘ মাসের শেষ তিন দিনের মধ্যে বুধবারে এ মেলা বসে। মেলাটি একদিনের হলেও সপ্তাহব্যাপী উৎসব লেগে থাকে। দূরদূরান্ত থেকে মেলা দেখতে ছুটে আসে কয়েক হাজার লোকজন। মেলার প্রধান আকর্ষণ মাছ। বড়ো বড়ো হরেক প্রজাতির মাছ পাওয়া যায় বলে অনেকে একে মাছের মেলাও বলে। এছাড়াও এ মেলাকে বিভিন্ন নামে ডাকলেও এটি মূলত পোড়াদহ মেলা নামেই সবার কাছে পরিচিত। মেলায় মাছের পাশাপাশি কাঠের, স্টিল ও লোহার বিভিন্ন ডিজাইনের

আসবাবপত্র সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। থাকে কসমেটিক্স ও গিফট সামগ্রী। এ মেলার আরো একটি অন্যতম আকর্ষণ বড়ো বড়ো মিষ্টি। একেকটি মিষ্টি দেড় থেকে দুই কেজি ওজনের হয়ে থাকে। মেলায় ছোটোদের আনন্দের জন্য রয়েছে নাগরদোলা, মিনি ট্রেন, ঘোড়ার গাড়ি, সার্কাস ইত্যাদি আর বড়োদের জন্য রয়েছে মটর সাইকেল খেলা, যাত্রাপালা প্রভৃতি।

রুহিয়া আজাদ মেলা

বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের উল্লেখযোগ্য একটি মেলা। এটি ঠাকুরগাঁও জেলার রুহিয়া উপজেলায় অবস্থিত। প্রতি বছর কার্তিক মাসের রাস পূর্ণিমার দিন থেকে শুরু হয়ে একমাস জুড়ে এ মেলা চলে। মজার বিষয় হলো, গরু-মহিষ কেনাবেচার জন্যই এ মেলার নামডাক ছিল। পছন্দের পশু কিনতে ভিড় করত দেশের বিভিন্ন জেলার মানুষ। কৃষি যন্ত্রপাতির বিবর্তনের ফলে মেলায় কেনাবেচারও পরিবর্তন এসেছে। এখন মেলার প্রথম দু-এক দিনেই পশু বিক্রি শেষ হয়ে যায় এবং পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন গৃহস্থালী তৈজসপত্র, শিশুদের খেলনা, খাদ্যসামগ্রী প্রাধান্য পায়। এছাড়া মেলার মূল আকর্ষণ হলো সার্কাস ও যাত্রাপালা। অনেক পুরনো এ মেলা বহুদিন বন্ধের পর ১৯৫৯ সালে নতুন উদ্যোগে এটি চালু করা হয়।

আটোয়ারী আলোয়াখোয়া মেলা

দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ২০০৭ সাল থেকে পঞ্চগড় জেলার আটোয়ারী বালিয়া সীমান্তে নাগর নদীর ধারে এ মেলা বসে। এর পুরাতন নাম আলোয়াখোয়া মেলা। শুধু একবেলার জন্য রাস পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর পাশাপাশি বর্তমানে রুহিয়া আজাদ মেলা এবং আটোয়ারী আলোয়াখোয়া মেলাও সচল রয়েছে। এ মেলাটি দেখতে অনেক দূরদূরান্ত থেকে লোকজন ছুটে আসে। উপভোগ করে নানা অনুষ্ঠান, সাথে চলে মজার মজার খাওয়াদাওয়াও।■

সিনিয়র রিপোর্টার, রাইজিংবিডি.কম

মেলা

মিয়াজান কবীর

নদীর পাড়ে বটের ছায়ায়
বসছে সখের মেলা,
আয়রে তোরা দেখবি যদি
হরেক রকম খেলা।
নাগরদোলা, সার্কাস-যাত্রা
আরো ঝুমুর নৃত্য,
পুতুল নাচের ছায়াবাজি
দোলায় সবার চিত্ত।
মুড়কি- মোয়া, কদম-নাড়ু
ইন্নিধানের বিন্নি,
ঝিটকা হাটের গুড়-বাতাসা
কাঁচা দুধের ফিরনি।
খেতে খুবই মজা পাবে
তিল্লির হাটের চিড়া,
ঢাকাই জোড়ার তরমুজ- বাঙ্গি
সুয়াপুরের খিরা।
মেলায় এসব পাবে সবই
পাবে বাঁশের বাঁশি,
বাঁশের বাঁশির সুরে সুরে
ফুটবে সবার হাসি।

মেলায় খুকুমণি

দীপ্ত দাস

ছোট্ট খুকু যায় যে মেলায়
দাদুর হাতটি ধরে
অনেক কিছু কিনবে সে
একটি দুটি করে।
নাগরদোলায় চড়বে সে
করবে অনেক মজা
মুড়ি, মুড়কির সাথে
খাবে প্রিয় তিলের খাজা।

সপ্তম শ্রেণি, পাহাড়তলি মডেল স্কুল, চট্টগ্রাম

মেলার যত খেলা

মেজবাউল হক

মেলার আক্ষরিক অর্থ মিলন। একটি স্থানে অনেক মানুষের একত্রিত হওয়া। এটি বাংলার ঐতিহ্যের ধারক-বাহক। মেলার সঙ্গে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি ও সংস্কৃতির যোগাযোগ নিবিড় । মেলাকে ঘিরে গ্রামীণ জীবনে আসে প্রাণচাঞ্চল্য। গ্রামের মেলায় যাত্রা, জারি-সারি, রামায়ণ, গম্ভীরা কীর্তন, পালার আসর, ষাঁড়ের লড়াই, মোরগের লড়াই, লাঠি খেলা, হাডুডু খেলা মুগ্ধ করে আগত দর্শনার্থীদের। রয়েছে আরো কিছু মজার খেলা। যা সব বয়সিদের কাছে প্রধান আকর্ষণ। তেমনি কিছু মজার খেলার কথা জানাচ্ছি তোমাদের–

নাগরদোলা

নাগরদোলা বাংলা সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। নাগরদোলা ছাড়া মেলাই যেন অসম্পূর্ণ। গোলাকারভাবে দোল খাওয়ার দোলনার নাম নাগরদোলা। এটি শক্ত কাঠ বা লোহার পাত দিয়ে তৈরি। শক্ত খুঁটির সঙ্গে কয়েকটি ডানা থাকে। প্রতিটি ডানার মাথায় আসন বসানো হয়। সেগুলো যাতে ঠিকমতো ঘুরতে পারে তার জন্য লাগানো হয় বিয়ারিং। আসনগুলোতে লাগানো হয় হাতল। ঘোরার সময় সবাই হাতল ধরে বসে থাকে, যেন পড়ে না যায়। সবার নজর কাড়তে একে নানা রঙে সাজানো হয়। মেলায় আসা শিশুদের কাছে এটি খুবই জনপ্রিয়। শুধু ছোটোরা নয়, বড়োরাও বেশ উৎসাহে নাগরদোলায় চড়ে আনন্দ লাভ করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন লোকজ উৎসব-পার্বণে এই নাগরদোলা দেখা যায়। এছাড়াও পার্কগুলোতে দেখা মিলে আধুনিক মানের নাগরদোলা।

পুতুল নাচ

গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী বিনোদনের প্রধান আসর পুতুল নাচ। যেখানে পুতুলের মাধ্যমে বিভিন্ন কাহিনি বলা হয়। শীতের সময় পুতুল নাচের আসর বেশি বসে। রং-বেরঙের বাহারি পুতুল সাজিয়ে তার সঙ্গে সুতো বেঁধে হাতের সুনিপুণ দক্ষতায় এটি পরিবেশিত হয়। বাদ্য, গান, নাচ ও অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হতো 'কাশেম মালার প্রেম', বেহুলা সুন্দরী, নৌকা বাইচ, সাগর ভাসাসহ বিভিন্ন পালা। ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল, ফরিদপুর, খুলনা, কুষ্টিয়া, যশোর ও রংপুরে পুতুল নাচের শিল্পীদের বেশি দেখা যায়। এদের মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পুতুল নাচের প্রাণকেন্দ্র। এ এলাকার শিল্পীরা এখনো পুতুল নাচের মূল ধারাকে টিকিয়ে রেখেছেন। বিভিন্ন ধরনের পুতুল

নাচ রয়েছে। সেগুলো হলো- সুতা পুতুল, হ্যান্ড পাপেট বা হাত পুতুল, রড পাপেট বা শিক পুতুল ও শ্যাডো পাপেট বা ছায়া পুতুল। বয়সে আট থেকে আশি সবাই মেতে উঠে এটি উপভোগ করতে।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ২০১৩ সাল থেকে 'বিশ্ব পুতুল নাট্য দিবস' উদযাপন করছে। প্রতি বছর ঐতিহ্যবাহী দলগুলোকে নিয়ে পুতুল নাট্য উৎসব হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পুতুল নাচের দলগুলো যোগ দেয়। নতুন নতুন গল্প, পুতুল নাট্য, নতুন পরিবেশনা করার সুযোগ পায়।

সাপ খেলা

গ্রামীণ মেলার একটি বড়ো আকর্ষণ ছিল সাপ খেলা দেখা। ছোটো-বড়ো বাক্স থেকে সাপ বের করে সাপুড়েরা সাপ খেলা দেখায় এবং মজার মজার গান গায়। কোবরা সাপের ফণা তুলে ফস ফস শব্দ শিশুদের মনে ভয় ধরিয়ে দেয়। আবার এটি বেশ উপভোগও করে তারা। মেলার এককোণে বা পাশে অনেকখানি জায়গা নিয়ে সাপুড়েরা সাপ খেলা দেখায়। পুরুষের পাশাপাশি বেদে মেয়েরাও সাপ খেলা দেখায়। তারা বেজি আর সাপের মধ্যে জমজমাট লড়াই দেখিয়ে সবাইকে আনন্দ দেয়। কালের বিবর্তনে এটিও হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের থেকে।

লাঠি খেলা

গ্রামবাংলার মানুষের কাছে জনপ্রিয় এক খেলা। সাধারণ মানুষের চিত্ত বিনোদনের একমাত্র উৎস। ঐতিহ্যবাহী এ খেলাটি বৈশাখি মেলা, বিয়েসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মানুষকে আনন্দ দিতে আয়োজন করা হত। কাঁসার শব্দে চারপাশে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়। কাঁসার বাদ্যের তালে তালে নেচে উঠে লাঠিয়ালরা। দেখায় শারীরিক নানান মজার কসরত। জড়িয়ে পড়ে একে অপরের সাথে লাঠি যুদ্ধে। লাঠি দিয়ে অন্যের আক্রমণ ঠেকিয়ে দেন। দলবেধে আগত দর্শকদের সালাম বিনিময় করেন। দর্শকরাও করতালির মাধ্যমে খেলোয়াড়দের উৎসাহ জোগায়। লাঠি খেলার আসরে কখনো কখনো নৃত্যগীত পরিবেশন করা হয়। উজ্জ্বল বর্ণের পোশাক পরে তারা সামাজিক রীতিনীতির নানা রূপ বিষয় নিয়ে কৌতুক উপস্থাপন করে থাকেন। বড়োদের পাশাপাশি ছোটো লাঠিয়াল খেলোয়াড়রাও এ খেলাটি খেলে থাকে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এ খেলার আসর এখনো বসে থাকে। সরকারিভাবেও এটির আয়োজন করা হয়।■

অদ্ভুত মেলা

বশিরুল ইসলাম

আমার দেখা এ যাবৎ অদ্ভুত মেলার মধ্যে বউ-শাশুড়ির মেলা অন্যতম। এই বছর ৮ ও ৯ই মার্চ লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার সিংগীমারী ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ অদ্ভুত এই মেলার আয়োজন করে। ইউপি চেয়ারম্যানের উদ্যোগে কিছুটা নতুনত্ব আনার জন্য এরকম মেলার আয়োজন করা হয়।

মেলায় আসা শাশুড়ি-বউয়ের মধ্য থেকে আদর্শ শাশুড়ি-বউ নির্বাচন করা হয়। আশপাশের গ্রাম থেকে অনেক শাশুড়ি-বউ মেলায় অংশগ্রহণ করে। এ বছর অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে উপজেলার সিংগীমারী গ্রামের আবু বরকতের স্ত্রী আঞ্জুমান আরাকে আদর্শ শাশুড়ি ও একই গ্রামের আমির হোসেনের স্ত্রী বিউটি বেগমকে আদর্শ বউ ঘোষণা করা হয়। মেলায় খেলনাসামগ্রী ও মন্ডা-মিঠাইয়ের স্টলের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

জামাই মেলা

বউ-শাশুড়ির মেলা থাকবে আর জামাই মেলা থাকবে না তা কি হয়। তবে মেলা মানেই যে বেচাকেনা তা নয়। জামাই মেলা নাম হলেও এখানে জামাই বেচাকেনা হয় না। এই মেলার উদ্দেশ্য সাধারণত মেয়ে জামাইকে আপ্যায়ন করা। বছরের অন্যান্য সময় গ্রামবাসীরা অপেক্ষা করে এই ব্যতিক্রমধর্মী মেলার জন্য। জামাই মেলা দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে পালন করে। যেমন:

বগুড়ার শেরপুর উপজেলায় পাঁচ শতাব্দী ধরে প্রতি বছরের জৈষ্ঠ্যের মাঝামাঝি সময়ে এ উৎসব পালন করে। আর এই উৎসব উপলক্ষ্যে ৪৫৯ বছর ধরে চলে আসা ঐতিহ্যবাহী কেল্লা পোষী মেলা স্থানীয়দের ভাষায়, যাকে 'জামাইবরণ' মেলাও বলা হয়ে থাকে।

প্রায় সব জামাই মেলার ক্ষেত্রে একইরকম আয়োজনের ব্যবস্থা রাখা হয়। গ্রামের গেরস্থরা মেলা উপলক্ষ্যে মেয়ে-জামাইকে দাওয়াত করে। মেলার কয়দিন মেয়ে-জামাইকে নানা উপহার এবং সালামি দেওয়া ছাড়াও সব ধরনের মিষ্টান্ন দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। এই উৎসব আনন্দে শরিক হতে দূরে বিয়ে দেওয়া মেয়ে আর জামাইরা অপেক্ষায় থাকে সারা বছর। মেলা উপলক্ষ্যে শ্বশুড়বাড়ি এসে সবকিছুকে ছাড়িয়ে জামাইরা মন ভরে উপভোগ করে শ্বশুড়বাড়ির আদর-আপ্যায়ন।

জামাই মেলায় শ্বশুড়বাড়ি থেকে তাদের জামাইদের হাজার হাজার টাকা দেওয়া হয়। সেই টাকার সাথে কিছু টাকা যোগ করে জামাইরা শ্বশুড়বাড়ির জন্য এই মেলা থেকে বড়ো বড়ো মাছ, মিষ্টি কিনে নিয়ে যায়। এ মেলায় জামাইরা বড়ো বড়ো মাছ কিনে বলে অনেক মাছ বিক্রেতা বড়ো মাছ নিয়ে মেলায় উপস্থিত হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শ্যালক-শ্যালিকার দাবি অনুযায়ী জামাইকে অনেক কিছু কিনে দিতে হয়।■

বিনিময় মেলা

খালেক আবদুল্লাহ

ভোরে সবাই তখনো ঘুম থেকে ওঠেনি। কিন্তু মাঠে উপস্থিত হয়ে গেছেন শুঁটকি ব্যবসায়ীরা। চারপাশজুড়েই বস্তাভর্তি শুঁটকি। ব্যবসায়ীরা দোকান সাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কথা বলার ফুরসত নেই তাদের। এটি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর উপজেলার ঐতিহ্যবাহী শুঁটকি মেলার সকালের চিত্র। উপজেলার কুলিকুন্ডা গ্রামের কুলিকুন্ডা (উত্তর) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে প্রতি বছর বাংলা নববর্ষের দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ বৈশাখের ২ ও ৩ তারিখে এ মেলার আয়োজন করা হয়। পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য ধরে রাখতে স্থানীয় জেলেরা এই দিন মেলার আয়োজন করেন। কবে মেলার প্রথম আয়োজন হয়েছিল তা কেউ জানে না। কেউ কেউ বলেন, শুঁটকির এ মেলা ৪০০ বছরের পুরোনো। আবার কেউ ২০০ থেকে ৩০০ বছরের পুরোনো বলে মনে করেন।

অনেকের ধারণা মুদ্রার প্রচলন যখন হয়নি, তখন স্থানীয় জেলেরা নিজেদের উৎপাদিত শুঁটকি নিয়ে এখানে আসতেন। স্থানীয় কৃষকেরা তাদের উৎপাদিত ধান, চাল, ডাল, শিমের বিচি, আলু, শর্ষে, পেঁয়াজ, রসুনসহ নানা পণ্যের বিনিময়ে শুঁটকি কিনতেন। এ মেলার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল পণ্যের বিনিময়ে শুঁটকি কেনাবেচা। পণ্য বিনিময়ের এ প্রথা স্বল্প পরিসরে কয়েক বছর আগেও ছিল। করোনা মহামারির পর থেকে তা আর নেই। অন্য এলাকা থেকে ব্যবসায়ীরা শুঁটকি বেচাকেনা করতে এ মেলায় আসেন। শুঁটকির পাশাপাশি মেলায় গৃহস্থালি সামগ্রীসহ শিশুদের নানা ধরনের খেলনাও বিক্রি হয়।

ঘোড়ার মেলা

জয়পুরহাটে প্রতি বছর জমে উঠে প্রায় ৫১৫ বছরের পুরনো ঐতিহ্যবাহী ঘোড়ার মেলা। আক্কেলপুর উপজেলার গোপীনাথপুর ইউনিয়নে প্রতি বছর দোলপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে এ মেলা বসে। দোলপূর্ণিমার দিন থেকে মেলাটি শুরু হয়ে চলে মাসব্যাপী। এই মেলাকে কেন্দ্র করে আশপাশের গ্রামে চলে উৎসবের আমেজ। এই মেলার মূল আকর্ষণ ঘোড়া। পুরনো এই মেলা শুরু থেকেই ঘোড়ার জন্যই প্রসিদ্ধ ছিল। আগে মেলায় ভুটান, নেপাল, ভারত, পাকিস্তানসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে উন্নত জাতের ঘোড়া আসত। বর্তমানে টাঙ্গাইল, দিনাজপুর, জামালপুর, ময়মনসিংহ, পাবনা, খুলনা, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা, রংপুর, পঞ্চগড়, মুন্সিগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ঘোড়া ব্যবসায়ী ও ক্রেতারা আসেন এখানে ঘোড়া কেনা-বেচা করতে। ক্রেতারা দেখেশুনে পছন্দমতো ঘোড়া কিনে নেন। এটি দেশের একমাত্র ঘোড়া মেলা বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা। মেলায় দুই থেকে ১০ কেজি ওজনের মিষ্টান্নর আকর্ষণ ধরে রেখেছে দীর্ঘদিন থেকে। এদিকে প্রতিদিন বিকেলে একটি খোলা মাঠে চলে ঘোড়ার দৌড় প্রতিযোগিতা। ঘোড়ার ক্ষিপ্রতা পরীক্ষার জন্য এই ঘোড়া দৌড়ের আয়োজন করা হয়। অনেক ক্রেতারা এখানে ঘোড়ার ক্ষিপ্রতা দেখে ঘোড়া কিনেন। ■

বাণিজ্য মেলা

আলেয়া রহমান

বাংলাদেশে আয়োজিত হরেক রকম মেলার মধ্যে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা খুবই জনপ্রিয়। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, ইরান, জাপান, চীন, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানিসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান মেলায় নিজেদের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শন করে। দেশীয় পণ্যসামগ্রী প্রদর্শন ছাড়াও রপ্তানি বাজার অনুসন্ধান এবং দেশি-বিদেশি ক্রেতার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে এ মেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিল্পপণ্য ও ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারীরা একদিকে তাদের উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান, নকশা, প্যাকেজিং ইত্যাদি প্রদর্শন ও বিপণন করতে পারেন, অন্যদিকে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপনসহ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাণিজ্য প্রসারের সুযোগ হয়।

এ মেলা প্রতি বছর জানুয়ারি মাসের ১ তারিখে আরম্ভ হয়ে ৩১ তারিখ শেষ হয় অর্থ্যাৎ পুরো ১ মাস ধরে চলে এ মেলা। ২০২১ সাল পর্যন্ত এই বাণিজ্য মেলা শেরেবাংলা নগরে আয়োজিত হতো। ২০২২ সাল থেকে পূর্বাচলে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ- চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে আয়োজিত হচ্ছে। ঢাকা ছাড়াও বিভাগীয় শহরগুলোতেও বাণিজ্য মেলা আয়োজন করা হয়ে। বাণিজ্য মেলা বাংলাদেশ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর উদ্যোগে আয়োজন করা হয়।■

বৈশাখি মেলা

সালাম ফারুক

রং-বেরঙের সাজ সেজেছে বোশেখের এই মেলা
হাজার মানুষ ভিড় করেছে খুব যে সকাল বেলা।

প্রবেশদ্বারে আঁকা যেন বাংলা মায়ের ছবি
মায়ায় পড়ে ওপর থেকে হাসছে দেখো রবি।

দৃষ্টি জুড়ায় পুতুলনাচে আর যে বায়োস্কোপে
নাগরদোলায় চড়তে গিয়ে পড়ছি ভিড়ের তোপে।

পুতুল আছে, খেলনা আছে, আছে ঘটি-বাটি
প্লাস্টিকে বা কাঠে গড়া, নয়ত পোড়ামাটি।

চরকি হাতে শিশু মাতে, চালায় পাখির গাড়ি
মনে মনে দিচ্ছে যেন খুশির সাগর পাড়ি।

পশুপাখির বেলুন মেলে, বিচিত্র সব ঘুড়ি
প্রসাধনী, গয়নাগাটি, শতেক রকম চুড়ি।

হাওয়াই-মিঠাই খই-জিলাপি মোয়া-নাড়ু পিঠা
বাতাসা আর কদমা খেয়ে মুখ হয়েছে মিঠা।

মঞ্চ থেকে ভেসে আসা মাটির গানের তালে
এ বাঙালি পা দিল আজ বঙ্গ নতুন সালে।

পহেলা বৈশাখ

আবুল হোসেন আজাদ

নতুন বছর নতুন বছর
পহেলা বৈশাখ,
পুরনো যা জীর্ণ জরা
সব উড়ে আজ যাক।

নতুন বছর দিক ছড়িয়ে
স্বপ্ন নতুন দিন,
সামনে চলার দিনগুলো হোক
ঔজ্জ্বল্যে রঙিন।

নতুন বছর এসে নতুন করে
জীবন কাটুক ছন্দে সুখে ভরে।

বৈশাখি হাওয়া

রাশেদ আহাম্মেদ সাদী

খট্ খট্টে গরমে
কট্ কট্ করে গায়,
গরম যে চরমে
পানি খেতে বলে মায়।

আকাশের মেঘমালা
থেকে থেকে ডেকে যায়,
টিয়ে আর কাকাতুয়া
পালা করে গান গায়।

ধূলি মাখা বাতাসে
শোনা যায় শন শন,
ঝড়ো ঝড়ো বৃষ্টিতে
হেসে উঠে চাঁপা বন।

বোশেখ দিনের স্মৃতি

খোরশেদ আলম নয়ন

মায়ের বারণ পিছু ফেলে-কালবোশেখি ঝড়ে
বৃষ্টি ভিজে আম কুড়াতাম দিদির আঁচল ভরে!
নদীর তীরে বটের ছায়ায় বসত বোশেখ মেলা
ডাক দিয়ে যায় নিবিড় মায়ায় প্রিয় কিশোর বেলা

আর বাজে না মেলায় কেনা সবুজ পাতার বাঁশি
হারিয়ে গেছে দিদির চোখের স্বপ্ন রাশি রাশি!
মেঘনার তীরে সেই শৈশব স্মৃতির তুলিতে আঁকা
শ্যামলে সবুজে গ্রামখানি ছিল মমতায় মধু মাখা।

পাখির গানে সকাল হতো- সূর্যকিরণ ঢেলে
ঘুম ভাঙাতো জগৎশিশুর চোখের পাতা মেলে।
ফুলের বনে ফুলকলিরা পাপড়ি মেলে সব
চাঁদের সনে কইত কথা করত কলরব।

তুলসী তলায় সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালতো বধূ সাঁঝে
হারিয়ে গেছে চিরচেনা সেই মায়াবি গাঁ যে!
মুর্শিদি আর ভাটিয়ালি -জারি সারি গান
দুর্গাপূজার উৎসবেও ছিল মাটির টান।

নেই যে আজ আর শ্যামল সে গাঁও কী করে দিন কাটাই
হারিয়ে গেছে কিশোর বেলার রঙিন ঘুড়ি লাটাই।
নেই রাখালের বাঁশের বাশি -বাজে না আর নূপুর
নেই এখন আর ঘুঘু ডাকা উদাস করা দুপুর।

কোথায় যে আজ সেই খেলাঘর-সেই সুপুরিছায়া
কোথায় ধু ধু নিঝুম দুপুর-কাজল দিঘির মায়া!
নেই অনুপম দুর্গা-অপুর, ভাই ও বোনের প্রীতি
কালের ধূসর-ধুলোয় এখন-সবই শুধু স্মৃতি!

দাদার কবর-বেতসলতা সেই সোনালু ফুল
কোথায় দিদির দুঃখভরা রুক্ষ মাথার চুল।
কামরাঙা বন-সবুজ টিয়ে কচি পাতার আড়ে
অবুঝ কিশোর মনটা ছুটে যায় যে বারে বারে।

মায়ের হাতে আজ নড়ে না আর সে তালের পাখা
বুকের ভেতর বোশেখ দুপুর শুধুই করে খাঁ খাঁ!

বৈশাখে

কাজী নুসরাত সুলতানা

বছর শুরুর প্রথম যে মাস
সে হলো বৈশাখ
বোশেখ এলে সবার মনে
নতুন দিনের ডাক
বোশেখ মাসের প্রথম দিনে
পহেলা বৈশাখে,
ভোরের আলোয় গানের সুরে,
মন মাতিয়ে রাখে
রমনা বটমূলে জমা
গানের সে উৎসবে,
সূর্য ওঠা ভোরের বেলায়
আসবে ছুটে সবে
বৈশাখেতে শহর গ্রামে
মেলাই জমে মেলা,
হরেক রকম পসরা জমে
হরেক রকম খেলা
হঠাৎ করে আসতে পারে
বৈশাখি ঝড় ধেয়ে,
লণ্ডভণ্ড মেলার মাঠে
ঝড়ের আঘাত পেয়ে।
ঝড়ের সাথে বৃষ্টি আসে
শীতল করে ধরা,
আমরা জানি ভাঙার পরে
নতুন করে গড়া।

নতুন গানের সুর

গোপেশচন্দ্র সূত্রধর

আসছে আবার নতুন বছর
একটি বছর পরে
নতুন দিনের নতুন গান
সবার ঘরে ঘরে।

পুরাতনের যত গ্লানি
ফেলব মুছে তার
নতুন গানের নতুন সুর
বাজবে যে আবার।

নতুন চিন্তায় নতুন ভাবনায়
সামনে এগিয়ে যাব
পুরাতনের ভুলগুলি আজ
শুদ্ধ করে নেব।

নতুন ভাবনায় এগিয়ে যাব
সামনে অনেক দূর
বাঁধব আবার নতুন বছর
নতুন গানের সুর।

মেলার স্মৃতি

নিশি কাদের

গ্রামের মাঠে বসল মেলা
ভিড় করেছে অনেক লোক
মজার সব খেলনা দেখে
তাকিয়ে থাকি অপলক।

ছোটো বড়ো সব বয়েসি
করছে ছোটাছুটি মেলায়
শিশুরাও উঠল মেতে
দারুণ সব খেলায়।

মেলার সকল স্মৃতিগুলো
থাকবে আমার মনে
আবার আমি আসব ফিরে
এই মেলার অঙ্গনে।

একাদশ শ্রেণি
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল, ঢাকা

ফলের দিনে

মো.পারভেজ হোসাইন

বৈশাখ এল আম কুড়াবো
চলো সবাই বনে-
ফল-ফলাদির মিষ্টি সুবাস
জাগল সাড়া মনে।

ঝড়ো-হাওয়ায় আম-জাম
পড়বে টাপুর টুপ,
টোপর ভরে কুড়িয়ে নিতে
থাকব সবাই চুপ।

তাল-খেজুরের কাঁদিগুলো
কাটব বিকেল বেলা,
জাতীয় ফল কাঁঠাল খাবো
করব না যে অবহেলা।

ফলের দিনের ফলগুলোর
টইটুম্বুর রস-
মুখটি রঙিন করবো সবাই
মাখব হাতে কষ।

ফলের দিনের ফল খেয়ে যে
অনেক পুষ্টি পাবো,
খুশির আমেজ-মনের মাঝে
দেশের গানটি গাবো।

আমার সোনার বাংলা,
আমি তোমায় ভালোবাসি।

দ্বাদশ শ্রেণি, তেজগাঁও কলেজ, ঢাকা

অমর একুশে গ্রন্থমেলা

তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

বাংলাদেশে বইমেলার উদ্ভবের ইতিহাস খুবই মজার। বইমেলার চিন্তাটি এ দেশে প্রথমে মাথায় আসে প্রয়াত কথাসাহিত্যিক জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের সাবেক পরিচালক সরদার জয়েনউদদীনের। তিনি ষাটের দশকে বাংলা একাডেমির পরিচালক ছিলেন। সে সময় বাংলা একাডেমিতে প্রচুর বিদেশি বই সংগ্রহ করা হতো। এর মধ্যে একটি বই ছিল Wonderful World of Books. এই বইটি পড়তে গিয়ে 'Book' এবং 'Fair'. দুটি শব্দ দেখে তিনি পুলকিত বোধ করেন। এর কিছুদিন পরেই তিনি তৎকালীন কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির (বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি) নিচতলায় একটি শিশু গ্রন্থমেলার আয়োজন করেন। যতদূর জানা যায়, এটাই ছিল বাংলাদেশের প্রথম বইমেলা। এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৬৫ সালে।

শিশু গ্রন্থমেলার পরে ১৯৭০ সালে নারায়ণগঞ্জ ক্লাবের সহযোগিতায় নারায়ণগঞ্জে একটি গ্রন্থমেলার আয়োজন করা হয়। এরপর ১৯৭২ সালে ইউনেস্কো ওই বছরকে 'আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করে। গ্রন্থমেলায় আগ্রহী সরদার সাহেব এই আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ উপলক্ষে ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে একটি আন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলার আয়োজন করেন। সেই থেকেই বাংলা একাডেমিতে বইমেলার সূচনা।

১৯৭২ সালে, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলা একাডেমির দেয়ালের বাইরে স্ট্যান্ডার্ড পাবলির্শাসের রুহুল আমিন নিজামী তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রগতি প্রকাশনীর কিছু বইয়ের পসরা সাজিয়ে বসেন। তার সাথে মুক্তধারা প্রকাশনীর চিত্তরঞ্জন সাহা এবং বর্ণমিছিলের তাজুল ইসলামও তাদের বই নিয়ে বসে যান। ১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমির উদ্যোগে একটি বিশাল জাতীয় সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই মেলার উদ্‌বোধন করেন। সে উপলক্ষে নিজামী, চিত্তবাবু এবং বর্ণমিছিলসহ সাত-আটজন প্রকাশক একাডেমির ভেতরে পূর্ব দিকের দেয়াল ঘেঁষে বই সাজিয়ে বসে যান। সে বছরই প্রথম বাংলা একাডেমির বইয়ের বিক্রয়কেন্দ্রের বাইরে একটি স্টলে বই বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৮৩ সালে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কাজী মঞ্জুরে মাওলার উদ্যোগে বাংলা একাডেমিতে প্রথম অমর একুশে গ্রন্থমেলার আয়োজন করা হয়। বাংলার বর্তমান সময়ে এটি শুধু একটি গ্রন্থমেলা নয়; একুশের বইমেলা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও ভাষা আন্দোলনের ঐতিহ্য বহনের বাহন। এটি দেশের একটি জাতীয় পর্যায়ের মেলা।

একুশে গ্রন্থমেলার ব্যাপ্তি এখন বাংলা একাডেমি ছাড়িয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান পর্যন্ত পৌঁছেছে। যদি এভাবে বইমেলার জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে তবে আশা করা যায় এটি ঐতিহ্য ধরে রাখবে অনন্তকাল।■

ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলা

রেজা নওফল হায়দার

প্রযুক্তি আর সংযুক্তির মহাসড়কে বাংলাদেশ। সে মহাসড়ক ধরেই ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। সংযুক্তি গতি অটোমেশনের দুনিয়ায় এদেশ চলবে দুর্বার গতিতে। যেখানে লেনদেন হবে টাকা ছাড়া, যোগাযোগ হবে সিম ছাড়া– আর সব ধরনের কার্যক্রম চলবে কাগজ ছাড়া এমনই উদ্দেশ্য নিয়ে আয়োজন করা হয় ডিজিটাল মেলা। ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো জানায়, ২০৪১ সালে আধুনিক বিশ্বের কাছে ঈর্ষান্বিত সাফল্যের দোরগোড়ায় পৌঁছাবে দেশ। প্রান্তিক পর্যায় থেকে শহর সব স্থানে শিক্ষা, চিকিৎসা, বিনোদনে নিরবিচ্ছিন্ন সংযোগ ও সেবার নিশ্চয়তা থাকবে। কলকারখানাগুলোতে অটোমেশনের পাশাপাশি ওয়ান স্টপ সল্যুউশন হবে। এক্ষেত্রে প্রযুক্তি নিয়ামক ভূমিকা রাখবে। তারা প্রত্যয়দীপ্ত ঘোষণা দিয়েছে স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সমাজ, স্মার্ট অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হবে প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার। ২০২০ সালে প্রথম ডিজিটাল মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের মতো বড়ো জনসংখ্যাকে সম্পূর্ণভাবে নাগরিক সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে ডিজিটাল উদ্ভাবনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় ডিজিটাল মেলায়।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত মেলায় ছোটো-বড়ো প্যাভিলিয়ন এবং স্টলে আইসিটি কোম্পানি, টেলিকম অপারেটর, মোবাইল আর্থিক পরিষেবা দাতা, ইন্টারনেট এবং অবকাঠামো কোম্পানি অংশ নেয়। পাশাপাশি দেশের তরুণ উদ্ভাবকদের নিয়ে থাকে উদ্ভাবনী প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী। মেলার আয়োজনে সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবাদাতাদের সংগঠন আইএসপিএবি। রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত হয় ইন্টারনেট ও টেলিযোগাযোগ নির্ভর তথ্যপ্রযুক্তি ও সেবার প্রদর্শন ডিজিটাল মেলা। মোবাইল নেটওয়ার্কের ব্যবহার নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় সেমিনার। দুর্যোগের আগাম সতর্কতা জনগণ ও প্রশাসনের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করা হয় উপকূলীয় অঞ্চলে ই-জিএসএম এবং আশ্রয়কেন্দ্র ম্যপিং নিয়ে আলোচনা হয়। ৫ম শিল্পবিপ্লব ও ৫জি অবকাঠামো নিয়ে আলোচনায় উঠে আসে দক্ষতা অর্জন এবং ডিজিটাল ডিভাইস ও অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার শেখার প্রয়োজনীয়তা। হাইস্পিড ইন্টারনেট, আধুনিক ডিভাইস নিয়ে নতুন নতুন উদ্ভাবনের রাজ্যে বুদ হয়ে থাকে মেলায় আগতরা। সমাপনী অনুষ্ঠানে বেস্ট স্টল, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বেস্ট খুদে শিক্ষার্থী এবং রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়াও অংশগ্রহণকারী অর্ধশতাধিক উদ্ভাবনের মধ্য থেকে তিনটি উদ্ভাবনকে পুরস্কৃত করা হয়। ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলায় নতুনকে জানার আগ্রহ আর অপার বিস্ময় নিয়ে ডিজিটাল মেলার অত্যাধুনিক সব প্রযুক্তির সাথে পরিচিত হয় শিক্ষার্থীরা। এক্সপিরিয়েন্স জোনে শিশুরা পরিচিত হয় ভিআর, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার রোবট, ডিজিটাল ক্লাসরুমের সাথে।■

সাংবাদিক দৈনিক জনকণ্ঠ

মজার সব মেলা

সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

নৌকায় পিঠা মেলা

বন্ধুরা কখনো শুনেছ কি নৌকার গলুইয়ে বসে গরম দুধ আর খেজুরের রসে চিতই পিঠা ভিজিয়ে খেতে? অবাক করা ব্যাপার হলেও এমনই এক ব্যতিক্রমী পিঠার আয়োজন হয় ফরিদপুরের নগরকান্দা উপজেলার তালমা গ্রামে। স্থানীয়দের কাছে 'তপন ফকিরের মেলা' নামে পরিচিত এই পিঠা উৎসব চলে টানা তিনদিন। নৌকার মধ্যে ভেজানো এই দুধ চিতই পিঠা খেতে প্রতি বছর হাজারো মানুষ এই মেলায় ভিড় করে। তপন ফকির জানান, তিনি স্বপ্নে আদেশ পেয়েছিলেন মাঘ মাসে তিনদিন নৌকার গলুইয়ে ভিজিয়ে চিতই পিঠা খাওয়ানোর। সেই থেকে গত ৩০ বছর ধরে তিনি এ মেলার আয়োজন করে আসছেন।

খেজুর গুড়ের মেলা

'যশোরের যশ খেজুরের রস' কথাটি এখনো মানুষের মুখে মুখে থাকলেও খেজুর গাছের সংকটে দিনে দিনে হারিয়ে যাচ্ছে জেলার শত বছরের এ ঐতিহ্য। যে খেজুরের রস এবং গুড়ের জন্য যশোর বিখ্যাত সেই খাঁটি রস ও গুড় পাওয়া যেন এখন ভাগ্যের ব্যাপার। আর তাই খেজুর গাছ রক্ষা, গাছিদের সম্মান দেওয়া ও উৎপাদিত গুড় সঠিক দামে বিক্রির উদ্দেশ্যে দুই দিনব্যাপী খেজুর গুড়ের মেলার আয়োজন করে চৌগাছা উপজেলা প্রশাসন। গাছিরা নিজেদের তৈরিকৃত খেজুরের রসের নানান রকম গুড় ও রস নিয়ে মেলায় অংশগ্রহণ করে। ১৬ ও ১৭ই জানুয়ারি মেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় প্রায় ২০০ গাছি অংশ নেয়।

বাহারি বিড়ালের মেলা

নিজের প্রিয় বিড়ালটিকে বাহারি সাজে নানা ধরনের পোশাক পরিয়ে সাজিয়েছেন বিড়াল মালিকেরা। দেশি-বিদেশি জাতের বিড়ালদের এই জমজমাট মেলা বসেছিল ঢাকার মিরপুরে। পারসিয়ান ক্যাট সোসাইটি অব বাংলাদেশ মিরপুর ১- এর ১০ নম্বর ওয়ার্ড কমিউনিটি সেন্টারে এর আয়োজন করা হয়। এ মেলায় প্রায় ৩০০টি বিড়াল অংশগ্রহণ করে। বিড়াল প্রদর্শনীতে ছিল ফুটবল ম্যাচ, মনিবের ডাকে বিড়ালের কাছে আসা,বিড়ালের পোশাক প্রদর্শনী, বিড়ালদের র‍্যাম্প শো ও লটারির মাধ্যমে ভাগ্যবান বিড়াল নির্ধারণ ইত্যাদি। নানা আয়োজনে শেষ হয় 'ঢাকা ক্যাট শো- ২০২৩'।

পশুপাখির মেলা

রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র সংলগ্ন মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে দুইদিনব্যাপী পশুপাখির মেলা। ৬ই জানুয়ারি 'ঢাকা ক্যাটল এক্সপো-২০২৩' শিরোনামে এ মেলার উদ্‌বোধন করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান। মেলায় ছিল গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, উটপাখি ও অন্যান্য বিভিন্ন রকম পশুপাখি। এর মধ্যে মেলায় গরুর সংখ্যা বেশি ছিল।

মেলায় ক্রেতা-বিক্রেতা সবাই শিশু

টাঙ্গাইলে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে ব্যতিক্রমী শিশুমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৭ই মার্চ ২০২২ সকালে শহরের হাতেখড়ি প্রি- প্রাইমারি স্কুল কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ মেলায় শিশুরাই ছিল ক্রেতা - শিশুরাই বিক্রেতা। মেলার স্টলে বিভিন্ন ধরনের মজার সব খাবার ও খেলনা সামগ্রীগুলো বিনামূল্যে অন্যান্য শিশুরা সংগ্রহ করে। এই মেলা উপলক্ষ্যে শিশুরা মেতে উঠে আনন্দে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও শিশু দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের জন্য এই শিশুমেলার আয়োজন করে স্কুলটি। ■

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

শব্দধাঁধা

পাশাপাশি: ২. নদীতে নৌকা চালানোর প্রতিযোগিতা, ৫.এক ধরনের সামাজিক পাখি, ৭.মধুমাসের ফল, ৮.সালাদের উপাদান, ৯.জলচর চতুষ্পদী প্রাণী, ১০.রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কাব্যগ্রন্থ, ১২.আভিজাত্যপূর্ণ খাদ্যদ্রব্য, ১৩. কৌতুক

উপর-নিচ: ১. বাংলা দিনপঞ্জিকার প্রথম মাস, ৩. কারুশিল্পী, ৪. নববর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত জব্বারের বলিখেলা কোন জেলায় অনুষ্ঠিত হয়, ৬. পায়রা, ৭. ডালিম, ৮. যে গান গায়, ৯. কাঠ কাটার অস্ত্র, ১১. খাবার খাওয়ার জন্য ব্যবহৃত পাত্র

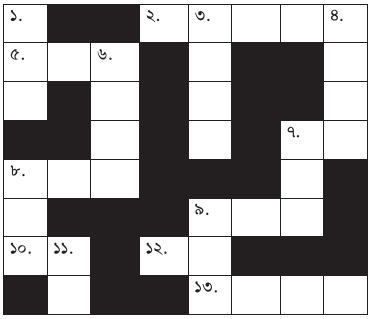

ছক মিলাও

শব্দ ধাঁধার মতোই এক ধরনের ধাঁধা ছক মিলাও। ছকে যে সব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেওয়া হলো।

সংকেত: বাংলা একাডেমি
বাকবাকুম, বাংলাদেশ, নাক
কাঠঠোকরা, ছোকরা, বাকু
মিনিট, নিদ্রা

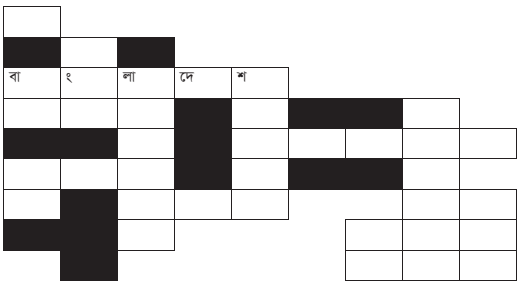

নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্ব্রিক্স। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপর-নিচ আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

৭৭		৭৯	৪৪		৮			৫
	৮১					১০	৩	
৭৫		৭১			৪০			১
	৭৩		৪৭			১২		১৪
৬৭		৬৯	৫০	৪৯			২৬	
	৬৩				৩৭	২৮		
৬৫		৬১		৩৫		২৯		
	৫৯				৩১		২৩	
৫৭			৫৪	৩৩		২১		১৯

ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হচ্ছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

৯	+		-	৬	=	
/		+		+		+
	*	২	-		=	২
+		*		-		/
৪	+		-	৫	=	
=		=		=		=
	-	৭	+		=	৫

তোমাদের জন্য সুখবর

বন্ধুরা, নবারুণের 'বুদ্ধিতে ধার দাও' এতদিন যারা উত্তর পাঠিয়েছ কিন্তু কোনো উপহার পাওনি এবার উপহারের পালা। সঠিক উত্তর দাতাদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে বিজয়ীকে দেওয়া হবে ৫০০ (পাঁচশত) টাকা প্রাইজবন্ড। এজন্য নবারুণ পত্রিকার পাতা (ফটোকপি প্রযোজ্য নয়) পূরণ করে বন্ধ খামে পাঠাতে হবে। খামের ওপর অবশ্যই লিখতে হবে 'বুদ্ধিতে ধার দাও'। পাঠাবে এই ঠিকানায়–

সম্পাদক, নবারুণ
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড
ঢাকা-১০০০

ছোটোদের আঁকা

মায়সুর ইযমান, কেজি টু, হার্ডকো ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ঢাকা

মাশরুর সাফির, ষষ্ঠ শ্রেণি, হার্ডকো ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ঢাকা

ছোটোদের আঁকা

মো. ইহসানুল হক বসুনীয়া, দ্বিতীয় শ্রেণি, মহানগর আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মুগদা, ঢাকা

মোছা: ওকি, একাদশ শ্রেণি, কুষ্টিয়া ইসলামিয়া কলেজ, কুষ্টিয়া

উম্মে মেহেজাবিন রাইসা, তৃতীয় শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা

আয়েশা ইসলাম, চতুর্থ শ্রেণি, উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা

Regd. Dha. 143, Monthly Nobarun, Vol-47, No-10, April 2023 , Tk-20.00
Memorandum No: 15.00.0000.019.05.003.16-211/2022

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা